বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের কাব্যসমগ্র

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

এথেনিয়াম ইনস্টিটিউশনের বাংলা সার বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের কাব্যের সন্ধান প্রথমে পাওয়া যায় ১৯৭৯ শারদীয় দেশ-এ প্রকাশিত রহস্যকাহিনী 'হত্যাপুরী'তে। বৈকুণ্ঠসারের গুনমুগ্ধ ছাত্র সর্বজ্ঞ গঙ্গে পাধ্যায় (লালমোহন গাঙ্গুলির বা জটায়ুর আসল নামল নামব 'রবার্টসনের দ্রি') এই প্রথম পুরী গেছেন, সঙ্গে প্রদোষচন্দ্র মিত্র আর তপেশরঞ্জন মিত্র। পুরীর সমুদ্র দেখে লালমোহনবাবু একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। কবিতাটির লেখক বৈকুণ্ঠনাথ। লালমোহনবাবু যখন ক্লাস সেভেনে পড়েন তখন এই কবিতাটি আবৃত্তি করে প্রাইজ পেয়েছিলেন। তিনি তপেশকে বললেন, কবিতাটির শেষের দুটো লাইন পার্টিকুলারলি ভাল, মন দিয়ে শুনলে বিউটিটা ধরা যায়,

অসীমের ডাক শুনি কল্লোল মর্মরে
এক পায়ে খাড়া থাকি একা বালুচরে।

প্রদোষ, যার ডাকনাম ফেলু, তপেশের ফেলুদা, লালমোহুবাবুকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করে না, পছন্দ করলেও। সাত বছর আগে (দ্র. বাক্সরহস্য, ১৯৭২) লালমোহনবাবুর ২১ টি রোমাঞ্চ রহস্য সিরিজের বই লেখা হয়ে গেছে, প্রত্যেকটির ৫টি এডিশন, বইয়ের টাকায় তিনটি বাড়ি, কিন্তু সুযোগ পেলেই ফেলু তাঁর বই নিয়ে ব্যঙ্গ করে। এই পুরী বেড়াতে আসার আগেএ সে লিখেছে,

বুঝে দেখ জটায়ুর কলমের জোর
ঘুরে গেছে রহস্য কাহিনীর মোড়
থোর বড়ি খাড়া
লিখে তাড়াতাড়া
এইবারে লিখেছেন খাড়া বড় থোর।

বিচিত্র কি, বৈকুণ্ঠনাথের কবিতা নিয়েও সে হেলাফেলা করবে। বলে কবি এখানে নিশ্চয়ই নিজেকে সারসের সঙ্গে আইডেন্টিফাই করেছেন, কারণ ঝোড়ো বাতাসে বালির উপর মানুষের পক্ষে এক পায়ে খাড়া থাকা চাট্টিখানি কথা নয়। আশ্চর্যের ব্যাপার, 'এক পায়ে খাড়া' এই বাংলা প্রবচনটি খেয়াল না করে ফেলু মন্তব্যটি করেছে। আমরা দেখব, বৈকুণ্ঠ সারের কাব্য উপভোগের ক্ষমতা ফেলু বা তোপসে কারোরই নেই, তবু কবিতা নিয়ে রঙ্গ করা চাই।

বাঙালি পুরী গেছে, কিন্তু ভুবনেশ্বর যায় নি, এটা বড়ো ঘটে না। লালমোহনবাবু তপেশকে নিয়ে ভুবনেশ্বরে গেছেন, রাজরানী, লিঙ্গরাজ কেদারগৌরী, মুক্তেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর সব দেখা চাই। ভুবনেশ্বর গিয়ে, বৈকুণ্ঠবাবুর চার লাইনের একটা গ্রেট পোয়েম আছে যেটা লালমোহনবাবুকে হন্ট করে, মুক্তেশ্বরের চাতালে দাঁড়িয়ে প্রায় চল্লিশজন দেশি-বিদেশি টুরিস্টের সামনে উনি সেটা গলা ছেড়ে আবৃত্তি করলেন,

কত শত অজ্ঞাত মাইকেল এঞ্জেলো
একদা এই ভারতবর্ষে ছেলো
নীরবে ঘোষিছে তাহা ভাস্কর্যে ভাস্বর
ভুবনেশ্বর।

মিল দেওয়ার জন্য ছিল কে 'ছেলো' করা তপেশের কাছে গ্রেট পোয়েটের লক্ষণ মনে হয় নি। সেটা শুনে লালমোহনবাবু বিরক্ত হয়েছিলেন, "পোয়েটের ব্যাকগ্রউন্ডনা জেনে ভার্স ত্রিটিসাইজ কনার বদ্ অভ্যাসটা কোথায় পেলে, তপেশ? বৈকুণ্ঠ মল্লিক চুঁচড়োর লোক ছিলেন। ওখানে ছিলকে ছেলোই বলে। ওতে ভুল নেই।"

বৈকুণ্ঠনাথের কবিতার সন্ধান আমরা এর পরে পাব পানিহাটিতে ১৯৮৩ সালে (দ্র. জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা)। লালমোহনবাবুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় যদিও ১৯৭১ সালে (দ্র. সোনার কেল্লা), কিন্তু রাজস্থানেস বা পরে সিমলায় (দ্র. বাক্সরহস্য), ইলোরায় (দ্র. কৈলাসে কেলেঙ্কারি) উত্তরবঙ্গের তরাইয়ে (দ্র. রয়েল বেঙ্গল রহস্য), কাশীতে (দ্র. জয় বাবা ফেলুনাথ), বোম্বে শহরে (দ্র. বোম্বাইয়ের বোম্বেটে), কাটোয়ার কাছে গোসাঁইপুরে (দ্র. গোসাঁইপুরে সরগরম), হাজারিবাগে (দ্র. ছিন্নমস্তার অভিশাপ) বা কলকাতাতেও (দ্র. গোরস্থানে সাবধান) বৈকুণ্ঠকাব্যের উল্লেখ পাই নি। কেন, বলা শক্ত। বৈকুণ্ঠ সার প্রকৃতির ভক্ত, দেশ পর্যটক, বিভিন্ন স্থানের উপর তাঁর কবিতা আছে। পুরী ভ্রমণের পরেও লালমোহনবাবু আমরা পেয়েছি কাঠমান্ডুতে (দ্র. যত কান্ড কাঠমান্ডুতে) মেচেদার কাছে বৈকুণ্ঠপুরে (দ্র. টিনটে

ারেটোর যীশু), সেখানেও বৈকুণ্ঠকাব্য নেই। পাওয়া গেল পানিহাটিতে। লালমোহনবাবুর অবশ্য ভুলো মন, কখন তাঁর কী মনে পড়ে, কী ভুলে যাবেন, আগে থেকে বলা মুশকিল।

তাঁর ভোলা মনের একটা প্রচয় পেয়েছি মেচেদা যাওয়ার রাস্তায়। তাঁর গাড়িতে (ফেলুর যা রোজগার, তাতে আর গাড়ি হয় না। আর
লালমোহনবাবু তো বলেইছেন, আমার গাড়ি ইজ ইকুয়াল টু আপনার গাড়ি) যেতে যেতে তিনি বলেছিলেন, ট্র্যাভেল ব্রডন্‌স্‌ দি মাইণ্ড। এটা তিনি শুনে আসছেন ছেলেবেলা থেকে, হয়তো বৈকুণ্ঠ সারের কাছ থেকেই। ''আর কত জায়গায় ঘোরা হল বলুন তো আপনার দৌলতে, - দিল্লি, বোম্বাই, কাশী, সিমলা, রাজস্থান, সিকিম, নেপাল - ওঃ। সিকিমে? ফেলু মিত্তির সিকিম গিয়েছিল একবারই, ১৯৭০ সালে (দ্র. গ্যাংটকে গন্ডগোল)। যেখানে নিশিকান্ত সরকার চলনেবলরে লালমোহনবাবুর মত হলেও, সত্যসত্যই তো আর নিশিকান্ত লালমোহন নন। অনেক পরে, ১৯৮৮ সালে (দ্র. শকুন্তলার কণ্ঠহার) লালমোহনবাবু জানিয়েছেন, গ্যাংটক তঁার দেখা হয় নি। পানিহাটিতে গঙ্গার উপরে বাগানঘেরা বাড়ি, জোৎস্নাতে মুগ্ধ লালমোহনবাবু, জানালেন, চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উপচে পড়ে আলো। ভুল ধরার ওস্তাদ ফেলু বলেস উপ্‌চে না, উছলে। অকুণ্ঠিত লালমোহনবাবু জানালেন, একটা মারাত্মক পোয়েম আছে চাঁদ নিয়ে, অবশ্যই বৈকুণ্ঠিত সারের, যিনি এই পোড়া দেশে রেকগনিশন পান নি। নিচু গলায় কথা বলছিলেন লালমোহনবাবু, কন্তু আবৃত্তির সময় গলা চড়ে গেল

আহা, দেখ চাঁদের মহিমা
কভু বা সুগোল রৌপ্যথালি
কভু আধা কভু সিকি কভু একফালি
যেন সদ্য কাটা নখ পড়ে আছে নভে -
সেটুকুও নাহি থাকে, যবে
আসে অমাবস্যা -
সেই রাতে তুমি তাই
অচন্দ্রম্‌পশ্যা!
একজন লেডিকে অ্যাড্রেস করা, লালমোহনবাবু তপেশকে বুঝিয়ে দেন।
পানিহাটির রহস্যভেদ করার পরে, লালমোহনবাবু জানানস প্রদোষ মিত্তির একজন জিনিয়াস। জিনিয়াস কাকে বলে? বৈকুণ্ঠ সার ব্যাখ্যা দিয়েছিলো,
অবাক প্রতিভা কছু জন্মেছে এ ভবে
এদের মগজে কী যে ছিল তা কে কবে?
দ্য ভিঞ্চি আইনস্টাইন খনা লালাবতী
সবারেই স্মরি আমি, সবারে প্রণতি।
এর পরের বছর, কেদারনাথে, আবার সন্ধান পাওয়া গেল বৈকুণ্ঠকাব্যের। যাওয়ার পথে মন্দাকিনী একরার বাঁ দিকে একবার ডানদিকে পড়ছে, শীত থেকে টাক ঢাকরে জন্য লালমোহনবাবু রাজস্থান থেকে কেনা কানঢাকা পশমের লাইনিং দেওয়া স্মার্ট চামড়ার টুপি পরে সুর করে কবিতা বলে যাচ্ছেন, ওরে তোরা ক জানিস কেউ, জলে কেন এত ওঠে ঢেউ। ওই দুটো লাইনই, বারেবারে শুনতে, ফেলু থাকতে না পেরে ভ্যাঙচাতে লাগল, ওরে তোরা ক জানিস কেউ, কেন বাঘ এলে ডাকে ভেউ, ওরে তোরা ক শুনিস কেউ, কংকংরের ঘেউ ঘেউ, খোকা কাঁদে ভেউ ভেউ। লালমোহনবাবুকে না ভেঙিয়ে, ফেলু যদি রবীন্দ্রনাথের নদী কবিতাটি আবৃত্তি করতে পারত, বোঝা যেত মুরোদ কত।
লালমোহনবাবু অবশ্য এসব ফিচকেমিতে ক্ষুব্ধ হন না। কেদারের পথে তিনি কী নেবেন, ঘোড়া না ডান্ডি, কেদারের পথ কীপকব সেবিষয়ে তাঁর কোনও ধারণা আছে কিনা জিজ্ঞাসা কপায়, তিনি মৃদু হেসে শুনিয়েছিলেন,
শহরের যত ক্লেদস যত কোলাহল
ফেলে পেছে সহস্র যোজন
দেখ চলে কত ভক্তজন
হিমগিরিবেষ্টিত এই তীর্থপথে
শুধু আজ নায়, সেই পুরাকাল হতে
সাথে চলে মন্দাকিনী
অটল গাম্ভীর্য মাঝে ক্ষিপ্রা প্রবাহিনী।
কী নেবেন? ঘোড়া না ডান্ডি? বৈকুণ্ঠ মল্লিক কী উপদেশ দিয়েছিলেন?
তবে শুন এবে অভিজ্ঞের বাণী -
দেবমর্শন হয় জেনো বহু কষ্টে মানি'
গিরিগাত্রে শীর্ণপথে যাত্রী অগণন
প্রাণ যায় যদি হয় পদস্খলন,
তাও চলে আরোহী চলে ডান্ডিবাহী

যষ্টিধারী বৃদ্ধ দেখ তাঁরও ক্লান্তি নাহি
আছে শুধু অটল বিশ্বাস
সব ক্লান্তি হবে দূর, পূর্ণ হবে আশ
যাত্রা অন্তে বিরাজেন কেদারেশ্বর
সর্বগুন-সর্বশক্তিধর

মহাতীর্থে মহাপুণ্য হবে নিশ্চয়
উচ্চকণ্ঠে বল সব - কেদারের জয়।

এই পাহাড়ে চড়া দিয়েই আমরা লক্ষ করি লালমোহনবাবু কীরকম শক্তপোক্ত হয়ে উঠছেন ফেলুদের সঙ্গে থেকে থেকে। বাক্সরহস্যের সময়, সেই ১৯৭২ সালে, সমলা থেকে এক হাজার ফিট উচুঁ ওয়াইড ফ্লাওয়ায় হলে যাওয়ার সময় লালমোহনবাবুর জিজ্ঞস্য ছিল, শেরপা লাগবে? বারো বছর পর, ঘোড়া বা ডান্ডিনয়, তিনি পায়ে হেঁটেই উঠছেন। ফেলু তাঁকে যত আন্ডার-এস্টিমেটই কক, ওদের ভোলা উচিত না, কেদার শহরে গুন্ডারা ফেলুকে মাটিতে পেড়ে ফেললেও তিনিই স্প ইক-দেওয়া লাঠির ঘায়ে গুন্ডাকে ঘায়েল করেছিলেন। যে ভাবে 'জয় কেদার' হাঁক মেরে লালমোহনবাবু হাঁটা শু করেছিলেন, তোলসে ভেবেছিল তাঁর এনার্জির অর্ধেক ওখানেই খরচ হয়ে গেল। সকালে হাঁটা দিয়ে সন্ধাবেলা কেদার পৌছে, লালমোহনবাবু বলেছিলেন, তাঁর দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নতুন এনার্জি পাচ্ছেন, 'এই হল কেদারের মহিমা'।

দুবছর পর দার্জিলিঙে আবার রৈকুন্ঠনাথ ফিরে এলেন। ১৯৮৬ সালে সেটাই লালমোহনবাবুর প্রথম দার্জিলিঙ ভ্রমণ। আগে অবশ্য তিনি একবার গুল মেরেছিলেন যে তিনি দার্জিলিঙ দেখা আছে (দ্র. বাক্সরহস্য)। কাঞ্চনজঙঘা প্রথম দেখার অনুভূতি লালমোহনবাবু কীভাবে প্রকাশ করেছিলেন? সাব্লাইম, স্বর্গীয়, হেভেনলি, অপার্থিব, অনির্বচনীয় ইত্যাদি বলে এবং শেষে বৈকুন্ঠ কাব্যের আবৃত্তি দিয়ে,

অয়ি কাঞ্চনজঙেঘ!
দেখেছি তোমার রূপ উত্তপবঙ্গে
মুগ্ধ নেত্রে দেখি মোরা তোমারে প্রভাতে
সাঁঝেতে আর এক রূপ, ভুল নেই তাতে -
তুষার ভাস্কর্য তুমি, মোদের গৌরব
সবে মিলি তোমারেই ত্র মোরা স্তব।

আবৃত্তির শেষে, দম নিয়ে, লালমোহনবাবু তপেশকে লক্ষ করতে বলেছিলেন, সম্বোধনে আ-কারটা এ-করে হয়ে যায়, সেটাকে কবি কাজে লাগিয়েছেন। এটাই গ্রেট পোয়েটের লক্ষণ। তপেশ সংস্কৃত ব্যাকরণটা ভালো জানে না বলে ব্যাপারটা নিয়ে এগোয় নি। সকালের কাঞ্চনজঙঘা বিকেলে আবার দেখা গেলে লালমে াহনবাবু আবার 'অয়ি কাঞ্চনজঙেঘ' শু করে কোনও কারণে আর এগোন নি।

দার্জিলিঙ থেকে ফিরে পরের বছর ফেলুরা কলকাতা ছেড়ে বের হয়নি, বেল ১৯৮৭ সালে, কাশ্মর অভিমুখে। তখনও কাশ্মীরে সন্ত্রাসের রাজত্ব শু হয় নি। ডাল লেকের জল কাচের মত স্বচ্ছ, হাওয়া নেই ঢেইও নেই, জলে ছায়া লড়েছে পাহাড়ের, পদ্ম শালুক শাপলা ফুটে আছে। স্ বভাতই লালমোহনবাবুর মনে পড়ে গেল তাঁর সারের কবিতা। যেটা তিনি বলেছিলেন ডিসেন্ট

করি হত শির
তোমারে প্রণমি কাশ্মীর
কুমারীকার অপর প্রান্তে
অবস্থান তব ভারতের উত্তর সীমান্তে
রাজধানী শ্রীনগর
ঝিলামের জলে ধোওয়া অপূর্ব শহর
কত হ্রদ, কত বাগ, কত বাগিচা
অন্য নগরের সাথে তুলনা করিতে যাওয়া মিছা।

এটা এমন কি ভালো কবিতা, লালমোহনবাবু চিটাই যে একটু গোলমেলেস তপেশ এমন ভাবলেও সেটা কথায় প্রকাশ করে নি। কবিতা আবৃত্তির পরে, লালমোহনবাবু গুনগুন করে গানও গাইছিলেন। তপেশ শুনল, সেটা নাকি উর্দু গজল। গুলমার্গে সন্ধ্যাবেলায় বেড়াতে বেড়াতেও তিনি গজল গেয়েছিলেন, তবে শীতের জন্য মধ্যে মধ্যে গিটকিরি এসে যাচ্ছিল।

এখানে লালমোহনবাবুর সঙ্গীতপ্রিয়তা নিয়ে দুটো-একটা কথা সেরে নেওয়া যেতে পারে। কলকাতাতে একদিন ভিআইপি রোডে যেতে যেতে লালমোহনবাবু গান ধরেছিলেন, জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে, কন্তু ফেলু তাঁর দিকে তাকাতেই, কেননা সময়টা ছিল অম াব্যস্যার রাত, তাঁকে গানটি গিলে ফেলতে হয়েছিল। (দ্র. নেপোলিয়নের চিঠি)। হাজারিবাগের রাস্তায় রাত্রিবেলা, দমকা হওয়ায় চঁ াদের আভা মিলিয়ে যাচ্ছে, লালমোহনবাবু গুনগুন করে গান গাইছিলেন, 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়', - সব কিছুই যে অ্যাপ্রো প্রিয়েট হতেই হবে, এমন কি কথা আছে। শহরের কৃত্রিমতার বাইরে প্রকৃতির কোলে গেলেই তাঁর গান গাইতে ইচেছ করে। অঘ্রাণ ম াসে যদি তাঁর 'ফাগুনের নবীন আনন্দে' গাইতে মন চায়,

.

তাতে কার কী-বলার থাকতে পারে। রবীন্দ্রসঙ্গ নীতে তাঁর স্টক কম, ফলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গান না-ও আসতে পারে। তোপসে অবশ্য ভ াবে, ওঁর চেহারায় গান মানায় না, গলায়ও না। এলোরায় তিনি আ-আ-আ- করে ক্লাসিকাল সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বেসুরে চলে গয়েছিলেন, যদিও তাঁর দাদামশাই নাকি খান তিরিশেক ওস্তাদী গান রেকর্ড করেছিলেন। পার্ক স্টীটে এক রেস্তরাঁয় বসে তিনি একব ার বিলিতি ধাঁচের সুরেও গান ধরেছিলেন।

তোপসে লালমোহনবাবুর চি নিয়ে কটাক্ষ করেছিল। ফেলুর জন্য লালমোহনবাবুকে মধ্যেমধ্যেই আপোষ করতে নতো। ১৯৭৭ সালে তিনি গাড়ি কেনেন (দ্র. গোরস্থানে সাবধান), সেকেন্ড হ্যান্ড, সারেগামা হর্ন, কটকটে মাদ্রাজ-ফিল্মমার্কা সবুজ রঙের। ফেলু আপত্তি করায় তিনি হর্নটা পাল্টে ছিলেন, কন্তু গাড়ির রঙ পাল্টান নি, বলেছিলেন, গ্রীনটা তাঁর কাছে বড় সুদিঙ লাগে।

কাশ্মীরের পরে ফেলু যায় লক্ষ্মৌতে, লন্ডনে, যেখানে বৈকুন্ঠ সারের আসার সম্ভাবনা কম। তিনি এলেন ১৯৯০ সালে মাদ্রাজে। প্রথম

দর্শনে লালমোহনবাবুর মাদ্রাজ শহর পছন্দ হয় নি, তাছাড়া মাদ্রাজের খাবারদাবার সম্পর্কে তাঁর খারাপই ধারনা যদিও করমন্ডল হোটেলে যাবার পর ভুল ধারনা চলে যাবে। প্রথম দর্শনে - তিনি অবশ্য বৈকুণ্ঠ সারের অতৃপ্তিই স্মরণ করেছেন।

বড়ই হতাশ হয়েছি আজ
তোমারে হেরিয়ে মাদ্রাজ! -
অন্য ভাষায় সাথে নাই কোনও মিল -
ইডলি আর দোসা খেয়ে তৃপ্তিবে রসনা?
ওরে বাবা। এ শহরে কেউ কভু এস না!

'তৃপ্তিবে' শব্দটাতে ফেলু বিস্ময় প্রকাশ করাতে লালমোহনবাবু জানালেন, হাইলি ট্যালেন্টেড বৈকুণ্ঠনাথের উপর মাইকেলের দস্তুরমতো প্রভাব ছিল। পোড়া দেশে বৈকুণ্ঠনাথ কল্‌কে পান নি। ফেলুরা এতদিনলক্ষ করেছে, বৈকুণ্ঠ মল্লিকের প্রসঙ্গে তিনি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েন, কোনওরকম সমালোচনা সহ্য করেন না।

বৈকুণ্ঠনাথের শেষ আর্বিভাব গোয়ালপাড়া গ্রামে। এটাই সম্ভবত ফেলুর শেষ রহস্য অভিযান। পুরী, দার্জিলিঙের মতো শান্তিনিকেতনেও লালমোহনবাবুর এই প্রথম ভ্রমণ। একজন লেখক হয়ে শান্তিনিকেতনে আগে আসেন নি, এতে ফেলু অবাক হওয়াতে, তিনি বলেছিলেন, ''ট্যাগোরের রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরিচি কিনা'', আর ''হনলুলুতে হুলুস্থুলু যে লেখতে পারে সে কবিগুর দেশ দেখে আর কী প্রেরণা পাবে?'' গোয়ালপাড়া দেখে, একটি খাঁটি গ্রামের চিত্র তাঁকে বৈকুণ্ঠ সারকে মনে করিয়ে দিল

বাংলার গ্রামে স্পন্দিছে মোর প্রাণ
সেই কবে দেখা - আজও স্মৃতি অম্লান
যেদিকে ফেরাও দৃষ্টি
মানুষ ও প্রকৃতি দুইয়ে মিলে দেখ কী অপরূপ সৃষ্টি।

কোপাই দেখেও তাঁর বৈকুণ্ঠকাব্য স্মরণে এল

জীর্ণ কোপাই সর্পিল গতি
মন বলে দেখে - মনোরম অতি
দুই পাশে ধান
প্রকৃতির দান
দুলে ওঠে সমীরণে
বলে দেবে কবি
বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের কাব্যসমগ্র

আঁকা রবে ছবি
চিরতরে মোর মনে।

বৈকুণ্ঠনাথের কাব্যসবগ্রে চরিত্র বুঝতে যাওয়ার সবচাইতে ভালো উপায় তাঁর ভাবশিষ্য লালমোহনের আকৃতি আর প্রকৃতির বিশ্লেষণ। ১৯৯০ সালে প্রদোষের মধ্যে একটা অবসন্নতা এসেছিল (দ্র. নয়ন রহস্য)। তার রকমসকম দেখে বপত্ত লালমোহন নানারকম বশেষণ ব্যবহার করেছিলেন হতোদ্যম, বিষণ্ণ, বিমর্ষ, নিস্তেজ, নিস্প্রভ, এমন কি মেদামারা। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে প্রদোষ জানিয়েছিল, পাঠকদের অভিযোগ, ফেলু মিত্তিরের মামলা আর জমছে না, তপেশের বিবরণ বিবর্ণ হয়ে আসছে, জটায়ু আর হাসাতে পারছেন না। কথা শুনে লালমোহন ক্ষেপে গিয়েছিলেন, ''হাসাতে পারছেন না? জটায়ু হাসাতে পারছেন না? আমি ক সৎ?

সত্যিই, জটায়ু ক সৎ?

তোপসে টিনটিনের ভক্ত। তার আর ফেলুর মতে রহস্য রোমাঞ্চ সাসপেন্স আর হাসতে ভরা এর চাইতে ভালো কমিক বই আর নেই (দ্র. কৈলাসে কেলেঙ্কারি)। তোপসের নিজের কাহিনীতেও ওই চারটি অনুপানের ইপস্থিতি লক্ষণীয় হাসি সাপ্লাই দেওয়ার জন্যই যেন তৈরি

হয়েছেন লালমোহনবাবু। অন্তত ঃ, ফেলুদার রহস্যরোমাঞ্চের প্রাথমিক পর্বে। এক ধরনের লোক থাকে যারা চুপচাপ বসে থাকলেও তাদের দেখে হাস পায়। তোপসে জানায় লালমোহনবাবু সেই ধরনের লোক। সোনার কেল্লা দেখতে যাওয়ার পথে তাঁকে ওরা প্রথম দেখে, অত্যন্ত নিরীহ, রীতিমতো রোগা, হাইটে তোপসের চাইতেও দু-ইঞ্চি কম। ইনিই জটায়ু, 'সাহারায় শহরণ' 'দুর্ধর্ষ দুশমন' বইয়ের লেখক ? তোসের পেট থেকেভসভসয়ে সোডার মতো হাসি গলা অবধি উঠে এসেছিল। ওই বইগুলো পড়ে তার ধারণা হয়েছিল, জটায়ুর চেহারা হবে জেমস্ বন্ডের বাবা। বাক্সরহস্যের সময় তোপসে লক্ষ করে, লালমোহনবাবুর শরীরটা চিমড়ে হলেও, মধ্যেমধ্যেই আস্তিনের ওপর থেকেই বাইসেপের মাপনেন, অথচ পাশের ঘরে কেউ হাঁচলে চমকে ওঠেন। ফেলু লালমোহনবাবুকে নেয়ে ঠাট্টা-তামাসা করতে পারে, কন্তু তোপসে?

১৯৬৫ সালে তপেশের বয়স সাড়ে তেরো, ফেলুদার সাতাশ (দ্র. ফেলুদা'র গোয়েন্দাগিরি)। ১৯৬৬ সালে, বাদশাহী আংটির খোঁজ করার সময়, ওদের বয়স দেখা যাচ্ছে ১৮ আর ২৭। কিন্তু আমাদের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কি ওদের বয়স বাড়বে? সোনার কেল্লা অভিযানে, ১৯৭১ সালে, ওদের বয়স হওয়া উচিত ছিল ১৯ আর ৩৩, কন্তু শোনা গেল তোপসের বয়স ১৫। লালমোহনবাবুর বয়স, আমরা শুনেছি, সোনার কেল্লা দেখতে যাওয়ার সময়, কমপক্ষে ৩৫। তিনি নিজেই বলেছিন, তাঁর জন্ম ১৯৩৬ সালে (দ্র. এবার কান্ড কেদারনাথে)। আর তিনি এক জায়গায় বলেছেন, ফেলু তাঁর চাইতে সাড়ে তিন বছরের ছোট (দ্র. গোপস্থানে সাবধান)। তাহলে, ১৯৯০ সালে নয়ন রহস্য সমাধানের সময় ওঁদের বয়স হওয়া উচিত, তোপসে ৩৮, ফেলু ৫১, লালমোহন ৫৪। লালমোহন ৫৪ ঠিক আছে, ফেলুও ৫১ ভাবা কষ্ট, তবু চলে যায়, কিন্তু তোপসে ৩৮? অতএব, এঁদের বয়স নিয়ে আর আলোচনা নয়। শুধু এটুকু বলে রাখা, ১৫ বছরের তোপসের ৩৫ বছরের লালমোহনবাবুর সঙ্গে ইয়ার্কি করা রীতিমরো অসৌজন্য।

লালমোহনবাবুকে হাস্যকর দেখানোর কোনও সুযোগই ছাড়ে না তোপসে। উটে চড়ার দৃস্যটা স্মরণ করা যাক, সোনার কেল্লা অভিযানে

জয় ম্যা -

''লালমোহনবাবুর মাটা ম্যা হয়ে গেল এই কারণেই যে, তিনি কথানি বলার বঙ্গে সঙ্গেই উটের পিছন দিকটা এক ঝটকায় উঁচু হয়ে গেল, যার ফলে নিনি খেলেন এক রাম-হুমড়ি। আর তার পরেই উলটো হ্যাঁচকয়ে 'হেইক' করে এক বিকট শব্দ করেই ভদ্রলোক একেবারে পারপেন্ডিকুলার।

লালমোহনবাবুর প্রথম প্লেনে চড়ার বিবরন দিচ্ছে তোপসে এভাবে,

''.....প্লেনটা যখন তীরবেগে রানওয়ের ওপর দিয়ে গয়ে হঠাৎ সাই করে মাটি ছেড়ে কোনাকুটি উপর দিকে উঠল, তখন লালমোহনবাবু দু'হাতে তাঁর সিটের হাতল দুটো এমন জোরসে মুঠো করে ধরলেন যে, তাঁর আঙুলের গাঁটগুলো সব ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আর তাঁর ঠোঁটের কোণ দুটো নীচের দিকে নেমে এসে তলার দাঁতের পাটি বেরিয়ে গেল, আর মুখটা হয়ে গেল হলদে ব্লটিং পেপারের মতো।''

বিপজ্জনক মূহূর্তে লালমোহনবাবুর ববরণ দিতে তোপসে কার্পণ্য নেই। সিমলার রাস্তায় ওঁদের গাড়ি আটকে অদৃশ্য মানুষ ওঁদের বেরিয়ে আসতে বলছে, সেই সময়ে ''আমার কানের কাছেই একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছিল কছুক্ষণ থেকে। আমি ভাবছিলাম সেটা গাড়ির ভেতর থেকে আসছে, এখন বুঝলাব, সেটা হচ্ছে লালমোহনবাবুর দাঁতে দাঁত লাগার ফলে।''

রিপন লেনের সেই ভুতুড়ে বাড়িতে (দ্র. গোরস্থানে সাবধান) প্ল্যানচেটে বসার সময়, আর্কিস মার্কিসদের টেবিলের পায়া ঠকঠক করে কাঁপার আগে, লুকয়ে সেই প্ল্যানচেটে দেখতে আসা তোপসের কাছেও কছু একটা ঠক্‌টক্‌ করে কাঁপছিলস কী আর কাঁপবে, লালমোহনবাবুর হাঁটু।

গোসাঁইপুরেও সেই একই অবস্থা। কাঠের টেবিলে হাতগুলো রাখার সঙ্গে সঙ্গে যে একটা টকটক শব্দ শু হলো। সেটা আর কছুই নাস লালমোহনবাবুর কাঁপা আঙুল টেবিলের ওপর তবলার বোল তুলেছিল, তিনি দাঁতে দাঁত চেপে হাত স্টেডি করেছিলেন।

কিন্তু এই ভীতুর ডিমই বারেবারে তোপসেদের বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন নানাবিধ অস্ত্রের সাহায্যে, তোপসে সেটা স্বীকার করতে পারবে? সিবলার রাস্তায় মোক্ষম সময়ে লালমোহনবাবু মেরকুমারের মাথায় ব্যুমেরাঙের বাড় মেরে হিরেটা বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর ও য়েপন কালেকশন করার হ্ নিয়ে তোপসে হাসে। একটা ভোজালি দেখিয়ে লালমোহনবাবু বলেছিলেন, যদি কেউ অ্যাটাক করে তাহলে জয় মা বলে চালিয়ে দেবেন সেই ভোজালি, নেপাল থেকে কেনা ভোজালি বলতে গেয়ে। এটা নিয়েও রঙ্গ করতে হবে? অথচ কাঠমান্ডুতে যন্ডার মাথায় জপযন্ত্রের বাড়ি মেরে তোপসেকে উদ্ধার করেছিলেন কে? কেদার শহরে স্পাইক দেওয়া লাঠির বাড়ি মেরে গুমডার হাত থেকে ফেলুকে বাঁচিয়েছিলেন কে? হঙ্কঙে তিনি একটা প্যাকিঙ কেস তুলে তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাফাতে রাধেশ্যাম গুন্ডার ব্রক্ষ্মতালু ফাটিয়ে রক্ত বের করেন নি? নেপালেয়নের চঠি উদ্ধার করতে গেয়ে বাপাতের সেই নীলকুঠর কাছে তোপসে আর ফেলু গুন্ডার ঘায়ে বেহুঁস হলো, কেন্তু জটায়ু অক্ষত, একটা হামানদিস্তা হাতে নিয়ে মাথার উপর তুলে হেলিকপ্টারের মতো বাঁই বাঁই করে এমন ঘুরিয়েছিলেন যে গুন্ডারা তাঁর ধারে কাছে আসতে সাহস পায় নি। সিমলার রাস্তায় ব্যুমেরাং দিয়ে গুন্ডাকে ঘায়েল করার পর কোথায় তাঁকে ধন্যধন্য করা হবে। অথচ বলা হলো, তিনি নিজেই অবাক হয়ে ব্যুমেরাংটার দিকে তাকিয়ে আছেন।

নিজের খর্বাকৃতি দিয়ে লালমোহনবার বেশ লজ্জিতই ছিলেন। প্রথম পরিচয়ে শুনেছিলেন, তাঁর হাইট ছিল পাঁচ সাড়ে তিন। অল্পবয়সে রড ধরে ঝুলে লম্বা হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কন্তু রড খুলে পড়ে গেল, হাঁটুর মালাই চাকি ডিসলোকেটেড হয়ে গেল, লম্বা হওয়ার হওয়া হল না। রয়েল বেঙ্গল রহস্যতে শোনা গেল, তাঁর হাইট পাঁচ চার। আধ-ইঞ্চি বাড়ল কী করে? পয়ত্রিশের পরে লম্বা হওয়া যায়? এটা মাপার ভুল হয়, আসলে তোপসে যখন তার রহস্যকাহিনী লিখতে শু করে, ঠিক করতে পারে নি,কতটা সত্য সে বলবে। যে জন্য 'ফেলুদা'র গোয়েন্দাগিরিতে তার নাম ছিল তপেশরঞ্জন বোস, পরের কাহিনী থেকে তার নাম হলো তপেশরঞ্জন মিত্র। বাদশাহী আংটি' পর্যন্ত ফেলু ছিল তার মাসতুতো ভাই। পরে 'কৈলাস চৌধুরীর পাথর' - এ সে তার জ্যেঠতুতো ভাই। অনেক পরে অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্যে এই জটিলতার নিরসন হয়েছে। এক কিশোরীর প্রশ্নের উত্তরে ফেলু বলে, তোপসে মিথ্যাবাদী নয়, প্রথম দিকে তোপসে গল্প বলবে ভেবে নিজেদের সত্য পরিচয় দেয় নি। গাগমেহনবাবুর হাইট সে একটু কমিয়ে শু করেছিল, তাঁকে কমিক দেখানোর জ্য, পরে কিছুটা শুধরে নেয়, বলে পাঁচ চার, - এইভাবেই আমাদের দেখতে হবে।

জিনসূত্রে হাইট পাওয়া, তবু লালমোহনবাবু চেষ্টার কসুর করেন নি। ডন বৈঠত বারবেল চেস্ট-এক্সপান্ডার বাদ দেন নি কছু। ওঁর হাইটে বেয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতিও হয়েছিল। হেদোতে বাটারফ্লাই স্ট্রোক দিয়ে লোকের ক্ল্যাপ আদায় করেছেন (দ্র. হত্যাপুরী) এথেনিয়াম ইনস্টিটিউশনে তাঁর হাইজাম্পে রেকর্ড ছিল, নেহাৎ ডেঙ্গুতে বাঁ হাঁটুটা.....(দ্র. জয় বাবা ফেলুনাথ)।

বয়স্কব্যক্তিকে তোপসে অবশ্য ঠেশ দেওয়া কথা শুনিয়েই গেছে। 'গোরস্থানে সাবধান'- এদেখতে পাচ্ছি কবরখানায় হাঁটতে হাঁটতে তোপসে জানাচ্ছে, কোনও কোনও সমাধি বেশ বেঁটে, লালমোহনবাবুর কাঁধ অবধি আসবে বড়ো জোর। তিনি যে বেঁটে সেটা তাঁকে বারেবারে মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি? রিপন লেনের ওই ভূতুড়ে ফেলু দারোয়ানকে ভক্কি দেওয়ার জন্য লালমোহনবাবুর পরিচয় দিয়েছিল, তিনি দারোগা। লালমোহনবাবু সঙ্গে সঙ্গে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে দাঁড়িয়ে হাইট ঝট করে দু-ইঞ্চি বাড়িয়ে নিয়েছিলেন।

তাছাড়া এখন মর্ডান মেডিসিনির যুগ। নতুন শর্ট পিল, দুটো এক্স দেওয়া নাম, ডিনারের পরে একটা খেয়ে নেলে শরীরের বেশ একটা কলপ দেওয়া ফিলিঙ হয়, মনে হয় যা ছাকে কপালে লড়ে যাই। তবে লে তিনি মধ্যেমধ্যেই অল্প কারণে বা বিনা কারণে অজ্ঞান হয়ে যান? সেটার কারণ, লালমোহন বলেন, সাহিত্যিকদের সহজে অজ্ঞান হয়ে যান? সেটার কারণ, লালমোহন বলেন, সাহিত্যিকদের সহজে অজ্ঞান হবার একটা টেনডেন্সি আছে, বিশেষত ভয় পেলে, কাপণ তাঁদের কল্পনাশক্তি লোকের চেয়ে অনেক বেশে ধারালো। এই কথাই তিনি বলেছিলেন তরাই জঙ্গলে। বাঘ দেখে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সঙ্গে যে তোপসে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু উঠে অজ্ঞান হয়ে ঝুলছিলেন। ফেলু ঠেশ দেওয়াতে তিনি বলেছিলেন, ''আরে মশাই, আমি তো বলেইছি, আমার কল্পনাশক্তিটি সাধারণ লোকের চেয়ে একটু বেশে। আপনারা বলছেন বাঘ, আর আমি দেখছি একটা লেলিহান অগ্নিশিখা, আর তার মধ্যে একটা পৈশাচিক দানব দাঁত খিঁচুচ্ছে, আর সেই সঙ্গে কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করা এক হুঙ্কার ছেড়ে একটা জেট প্লেন টেক অফ করছে আমারই ওপর ল্যান্ড করবে বলে। এতেও যদি সংজ্ঞা না হারাই, তো সংজ্ঞা জিনিসটা রটেছে কী করতে?'' যে তরবারিটি ছেড়ে তিনি গাছে লাফ দিয়েছিলেন, জ্ঞান ফিরে

পাবার পর (এবং বাঘটা মারা যাওয়ার পর) তিনি তরবারিটি হাতে নিয়ে আবার দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, যেন কিছুই হয় নি।
তিনি অজ্ঞান হন বটে, কিন্তু পারিপার্শ্বিকও বিবেচনা করতে হয়। সন্ধ্যের দিকে গোরস্থানে যেতে তাঁর একটু ইয়ে লাগে। কারই-বা না লাগে। দিনের বেলাতেও পার্ক স্ট্রীটের ওই পুরনো কবরখানায় এত ঝোপঝাড় গাছপালা কচুবন, যে জায়গাটা থমথমে হয়ে আছে। এগুচ্ছেন আর বিড়বিড় করছেন লালমোহনবাবু, দোহাই বাবা, তোমরা ধুলো..... ধুলো.....। তপেশ থাকতে না পেরে জজ্ঞসা করে, কী ধুলো ধুলো করছেন? ডাস্ট দাউ আর্ট, টু ডাস্ট রিটার্নেস্ট, লালমোহন জানলেন, ছোটবেলায় পড়েছেন। এ সবই তো ধুলো। তাহলে আর ভয় কীসের? কবিরা যে লেখে সবই কি আর সত্যি - লালমোহনবাবুর সংশয় - অর্থাৎ ভূতেরা সত্যিই ক ধুলো হয়ে গেছে, না কি ঘাড় মটকাতেও পারে? ইংরেজ কবি সম্পর্কে এবংবিধ সংশয় প্রকাশ করেই তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন, কেননা তাঁর পা পড়েছে গর্তে, আর গর্তে এক মড়ার খুলি।
কল্পনাশক্তি আছে বলেই প্রয়োজনে অভিনয়টা তিনি ভালোই করেন। বোম্বাইয়ের ফিল্ম ডিরেক্টর, গড়পারের পুলক ঘোষালমনে করতে পারেন ইনটিন সেভেনটিতে গড়পারে ফ্রেন্ডস ক্লাবে 'ভূশণ্ডীর মাঠে' প্লে হয়েছিল সরস্বতী পূজার, লালমোহনবাবু নদু মল্লিকের পার্ট করেছিলেন। একেবারে নদু মল্লিক, ফেলু অবাক হয়েছিল। কত কিছুই তো করেছেন তিনি, সবই ক আর বলা হয়েছে, লালমোহনবাবু বললেন (দ্র. দার্জিলিঙে জমজমাট), ''নর্থ ক্যালকাটায় ক্যারম চ্যাম্পিয়ন ছিলুম, ফিফটি নাইনে, এ খবর জানতেন? এনডিও রেন্স সাইক্লিং-এ আমার কত কীর্তি আছে, সে সব-আপনি জানেন? আবৃত্তি প্রতিযোগেতায় মেডেল পেয়েছি - একবার নায়, থ্রিটাইমস্। দেবতার গ্রাস পুরো মুখস্থ ছিল। ফিলবে অফার নিই নি। তখন থেকেই মাইন্ড মেক আপ করেছি যে লেখক হব। শখের লেখক নয়, পেশাদারী।'' দেবতার গ্রাস মুখস্থ রাখা চাট্টিখানি কথা নয় - অবশ্য ফেলুরও দেবতার গ্রাস মুখস্থ হয়েছিল মাত্র দুবার পড়ে (দ্র. বাদশাহী আংটি)।
তোপসে অবশ্য বালতে পারে, লালমোহনবাবু পঁচিশ বছরে অগেও ফিল্মে অফার পেয়েছিলেন, কেননা তাঁর চেহারাটাই বাংলা ফিল্মের কমিক অভিনেতার (দ্র. রয়েল বেঙ্গল রহস্য)। কমিক হোক আর যাই হোক, অভিনয়টা নিনি ভালোই করেন। কাঠমান্ডুতে শুয়োরের গলিতে গয়ে বাড়ি ভাড়া করার সময়ে ফেলুরা যখন তদন্ত চালাচ্ছে, তখন বাড়ি-ভাড়া করার অভিনয়টা পাকা করার জন্য লালমোহনবাবু খাটের গদি চেপে, বাথমের বাতি জ্বলিয়ে, টেবিলের দেরাজ খোলা যায় কিনা দেখার ভান করে বেয়ারাকে কনভিন্স্ করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আচার্যদের বাড়ির সামনে পান্ডিরে ফুটপাথে উড়িয়া চাকরের ছদ্মবেশে তিনি গোটা চারেক পান গালে রেখে দিয়ে, পিক না ফেলে (ফেলুর পরামর্শেই) উনিশঅ, তুঅ মাচি কাঁই বলে গেছেন (এটা কিন্তু ফেলুরা বাড়াবাড়ি মনে করেছে)। ওই তদন্তেই, রেসের বিন্দুবিসর্গ না বুঝলেও রেসের মাঠে তিনি ভয়ংকর মানোযোগ দিয়ে রেসের বইএর পাতা উল্টে যান। (দ্র. বোসপুকুরে খনুখারাপি)। অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্যে গঙ্গার পাড়ে তিনি সান্ধ্যে ভ্রমণের অভিনয় করেন বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে আঃ উঃ শব্দ করে (যদিও সেটা তোপসের কাছে কন্ভিনসিড লাগে নি)। দার্জিলিঙে ফিল্মে পার্ট লেয়ে, চুট হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পারসোনালিটির বদল ঘটে যায় - বেশ একটা মিলিটারি মেজাজ, জুতোর গোড়ালি দিয়ে শব্দ তুলে হাঁটা, ঠোঁটের কোণে একটা মৃদু হাসি ঝুলিয়ে এদিক - ওদিক চাওয়া।
তবে, এটাও মেনে নিতে হয়স লালমোহনবাবুর চেহারার মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে অনেকেই তাঁকে নিয়ে রগড় করতে ভালোবাসে। মগনলাল মেঘরাজ কখনো তাঁকে ডাকে নাইফথ্রোয়িঙে লক্ষ্য হওয়ার জন্য, বেছে বেছে তাঁকেই এলএসডি খাওয়ায়, তাঁকেই বাধ্য করে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে (সোফা থেকে উঠে গদিতে বসে লালমোহনবাবু বাধ্য হয়েছিলেন এই ভেবে, কীভাবে মেঘরাজ একটা লোকের উইক পয়েন্ট ধরে ফেলে। টানা পাঁচ মিনিট রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া লালমোহনবাবুর জীবনে ওই একবারই)। 'রবার্টসনের বি' তাঁকেই হিপনোটাইজ করার জন্য ডাকা হয়, 'ইন্দ্রজাল রহস্য' - তেও তাই।
লালমোহনবাবু নিজেও বালছিলেন, কোথাও গেলে সেই জায়গার মেজাজটা তাঁকে হরয়ে বসে। রাজস্থানে গয়ে নিজেকে তাঁর রাজপুত মনে হচ্ছিল, মাথায় হাত দিয়ে পাগড়ির বদলে টাক হাতে পড়ায় চমকে উঠেছিলেন। কাশীর ঘাটে গয়ে বৈরাগী বৈরাগী ভাব আসে। অলিতে গলিতে ঢুকলে মনে হয় কোমরে একটা ছোরা থাকলে হাতলে হাত বোলাতে পারতেন।
লালমোহনবাবুর ইংরেজি নিয়ে শুধু ফেলু নয়, তোপসেও যেভাবে রগড় কপত, সেটা অতি 'পীড়াদায়ক'। এই সত্য, তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন (দ্র. কৈলাসে কেলেঙ্কারি), ''আই অ্যাম দি কী বলে প্রোফেসর অফ হিস্ট্রি ইন দি সিটি কলেজ। অ্যান্ড দিস ইজ কী বলে মাই নেফেউ।'' এটাও সত্য, হাজারিবাগে বাঘ দেখে সেটা কর্তৃপক্ষেকে জানানোর জন্য, মার্সলগুলো টান করে ইংরেজতে পুট করলেন তিনি খবরটি, ''দি সার্কাস হুইচ এসকেপড ফ্রম দি গ্রেটম্যাজেস্টিক টাইগার - থুড়ি।'' এবং এটাও অস্বীকার করা যাবে না, অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্যভেদের পর তিনি বলেছিলেন, ''এগুস অয়েল দ্যাট অল্স ওয়েল।'' কিন্তু এটাও তো সত্য, তিনি দুবরাজপুরে মাবম-বাগ্নে, পাথরের চাঁই দেখিয়ে সাহেবকে ব্যাপারটা বুঝিয়েছিলেন প্রঞ্জল ভাষায়, ''ওয়েল, হোয়েন গড হনুমান ওয়জ ফ্লাইং থ্রু দ্য এয়ার উইথ মাউন্ট গন্ধমাদন অন হিজ হেড, সাম রক্স ফ্রম দি মাউনটেন ফেল হিয়ার ইন দুবরাজপুর।'' ফ্যানাটাস্টিক, ইলগু, হচকক, ইমপ্রেসারিয়া, ব্রিটানিয়া (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বলাতে গেলে), ইনকঙ্গিটো ইত্যাদি কেন বলেন, তোপসে জগ্যেস করলে তিনি জানান, আসলে তিনি ইংরেজিটা খুব তাড়াতাড়ি পড়েন, তাই সাবগুলো অক্ষর তাঁর চোখে পড়ে না। (দ্র. বাক্স রহস্য)। বম্বেতে ইন্স্পেক্টর পটবর্ধন লালমোহনবাবুকে জেরা করতে এসে জজ্ঞসা করে তিনিই মিঃ গাঙ্গুলি কি না, তিনি ইংরেজ বাংলা গুলেয়ে বালছিলেন, হাঁয়েস। বোম্বেটে - তে কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তারা ভেজেটিরিয়ান কি না, তাতে বলেছিলেন, ''নো নো, নন নন''। অপরিচিত ভদ্রলোক তাঁকে প্রদোষ ভেবে নিলে তিনি তাড়াতাড়ি প্রদোষকে দেখিয়ে বলেন, ''নো নো, হি হি''। কী খাবেন আজ, প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ''চিকেন হ্যাড ইয়ে স্টারডে, মাটনই হোক টুমরো।''
ঠিক আছে, জেনে নেওয়া গেল লালমোহনবাবু ইংরাজতে তেমন সড়গড় নন, আর পাঁচটা বাঙালির মতো। হিন্দিও বলেন বাঙালিককে জজ্ঞাসা করেছিলেন, দৌড়নে সেকেগা আপকা উট? ট্রেন ধরনে হোগা। সার্কাসের মালিককে প্রশ্ন করেছিলেন, শের তো ভাগিতাট হাউ?
তিনি কখনও দাবি করেন নি, তিনি ইংরেজি বা হিন্দি ভালো বলেন। তবে যেভাবে ফেলু আর তোপসে হাসে তাঁর ইংরেজ শুনে, তাতে আমরা বলতে বাধ্য যে সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তিনি ফেলুর বা তোপসের ভুল বাংলার দিকে আঙুল তোলেন নি। 'যত কান্ড কাঠমান্ডুতে' ফেলু শুনল সেন্ট্রাল হোটেলে মার্ডার হয়েছে, শুনে লালমোহনবাবুর ড্রাইভারকে বলল ''সেন্ট্রাল হোটেলে, চট-জলদি'', খিন লালমোহনবাবু বলতেই পারতেন,মশাই জলদি-টা ক্রিয়া বিশেষণ কিন্তু চট-জলদি শুধুই বিশেষণ। বাক্স রহস্যে রোপসে এয়ারপোর্টের ডিপারচার লাউঞ্জকে বলেছিল ওয়েটিঙ ম, লালমোহনবাবু হাসেন নি। 'এবার কান্ড কেদারনাথে' ফেলু প্রশংসাই করেছিল লালমোহনবাবুর, ''আপনার গল্প যতই গাঁজাখুরি হোক না কেন, স্রেফ মশলা আর পরিপাকের জোরে শুধু যে উতরে যায় তা নয়, রীতিমতো উপাদেয় হয়'', খিন তিনি হাসেন নি, পাক অর্থে পরিপাকের ব্যবহারে।
শান্তিনেকেতন যাওয়া হবে শুনে লালমোহনবাবু চিঠি লিখতে চাইলেন ঝিভারতীর এক অধ্যাপককে, ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলেন যিনি এবং যাঁকে লালমোহনবাবু স্কুলে কোনওদিন টেক্কা দিতে পারেন নি। ফেলু বাঁকা প্রশ্ন ছেড়েছিল, ''তার মানে আলনিও ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র স

ম্পর্কে সেটা কি বিশ্বাস করা কঠিন ব্যাপার?'' ''তা আপনার বর্তমান আই কিউ -'' পর্যন্ত বলে ফেলু আর কথা বাড়ায় নি।
ফেলুরও বালহারি, সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা নিয়ে আই কিউ মাপতে চায়। ওই শান্তিনিকেতন যাত্রায় বোলপুরে টেপাকোটা স্থাপত্যের কথা তোলায় লালমোহনবাবু জজ্ঞাসা করেছিলেন, ট্যারা কোঠা? মানে ব্যাঁকা বাড়ি? তাঁর সাধারণ জ্ঞান নিয়ে রঙ্গ শু হয়েছে একেবারে পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে। নিজের ওয়াটার সাপ্লাই উট নিজেই নিজের পাকস্থলীতে নিয়ে বেড়ায় লিখে ফেলুর ব্যাঙ্গর পাত্র হয়েছিলেন তিনি। তিনি নর্থ পোলে জলহস্তীর ফাইটের গল্প লিখেছেন সন্ধুঘোটকের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে (দ্র. বাক্স রহস্য), ভাবেন পেঙ্গুইন থাকে নর্থ পোলে (দ্র. ডা. মুন্সীর ডায়েরি)। বম্বের অ্যাপোলো বন্দর শুনে ভাবে অ্যাপোলো আবার কীসের বাঁদর। কিন্তু একেবারেই ক হস্তিমূর্খ তিনি? তিনিই কি ধরতে পাবেন নি যে বন্দার বোস লোকনি পাওয়ারফুলি সাসপিশাস্, কেননা সে বলেছিল, ট্যাঙ্গানাইকায় নেকড়ে মেরেছে - অথচ মার্টিন জনসনের বই পড়ে লালমোহনবাবু জানেন, আফ্রিকায় নেকড়ে নেই।
লালমোহনবাবু অনেক কিছু জানেন না, এটা ঠিক। যেমন তাঁর গাড়ির কলকব্জা জানার কী নেসেসিটি তা তিনি বুঝে ওঠেন না, যখন তঁার নিজের পায়ে কটা হাড় আছে না জেনেও দিব্যি চলে-ফিরে বেড়াচ্ছেন (দ্র. ছিন্নমস্তার অভিশাপ)। যখন যেটা দরকার পড়ে নিলেই হয়।যেমর সার্কাসে যড়যন্ত্রকাহিরী লিখতে গিয়ে তিনি পড়ে নেন সার্কাসের ইতিহাস এবং জানতে পারেন রামমোহন রায়ের হাতির সার্কাস ছিল। আবার সব কিছু জানলেও সে সব গ্রাহ্য করতেই হবে? ভ্যানকুবারে ভ্যানুকুভারেই রেখেছেন। হিরে দুহাজার ক্যারাটের হয় না? পৃথিবীর সব চেয়ে বড়ো হিরে স্টার অফ আফ্রিকা পাঁচশো আর কোহিনুর মাত্র একশো দশ ক্যারাটের? তা হোক, লালমোহনবাবু জানালেন, তিনি তাঁর গল্পে দুহাজার ক্যারাটের হিরেই রাখবেন।
প্রদোষ মিত্তির জটায়ুর লেখা নিয়ে যতই হাসিঠাট্টা কক, জটায়ুর নজর বরাবর উচ্চ দিকে। বিখ্যাত লোক ছাড়া তাঁর লেখা বই তিনি উৎসর্গ করেন না। 'মেমহাতঙ্ক' উৎসর্গ করেছিলেন রবার্ট স্কটের স্মৃতির উদ্দেশে, 'গোরিলার গোগ্রাস' ডেভিড লিভিংস্টোনের স্মৃতির উদ্দেশে, 'আণবিক দামব' (ফেলুর মতে যেটা ম্যাক্সিমাম গাঁজা) আইনস্টাইনের স্মৃতির উদ্দেশে। 'হিমালয়ে 'হৃৎকম্প' উৎসর্গ করেছিলেন তেনজিঙ নোরকের স্মৃতির উদ্দেশে। কেদারনাথে যাওয়ার সময় তিনি বুঝেছিলেন নোরকের মাহাত্ম্যটা কোথায়। যদিও উৎসর্গ করার সময় মোরকের স্মৃতির উদ্দেশে না হয়ে নোরককেই উৎসর্গ করা যেত, তখনও তিনি বেচে, তবে লালমোহনবাবু বহুদিন কাগজে নামটাম দেখেন নি, কনস্ট্যান্ট পাহাড়ে চড়েছে, পা হড়কে পাহাড়ে বোধ হয়.....
বেকায়দায় পড়া লালমোহনবাবুর বাগ্‌বিপর্যয়ও তোরসে মশকরার উপকরণ। মগনলাল নাইফ-থ্রোয়িঙে তাঁকে লক্ষ্য হওয়ার আমন্ত্রণ-জানালে তিনি বলেছিলেন, গ্যাঁ! তিনি বলতে চেয়েছিলেন 'অ্যা?' আর 'গেলুম' - সেটা ওই সঙ্কটময় মুহূর্তে 'গ্যা' হলেও তাতে হাসার কী আছে? তবে তোপসে বলতে পারে, সঙ্কমময় মুহূর্তে কেন, স্বাভাবিক অবস্থাতেও লালমোহনবাবুর ওরকম বর্ণ-বিপর্যয় ঘটে। রাজারানির পিকনিকে তাঁর 'বেঙুর' বলা মনে আছে? 'জল-মাটি-আকাশ' খেলায়, এই তিনটি শব্দের যে কোনও একটি বললে এবং বলার পর দশ গোনার মধ্যে জল বললে জলের, মাটি বললে মাটির আর আকাশ বললে আকশের একটি প্রাণীর নাম বলতে হবে। লালমোহনবাবু বলেছিলেন 'বেঙুর'। বেঙুর কী ধরনের প্রাণী জজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, আসলে তিনি ভেবে রেখেছিলেন ব্যাঙ, হাঙর আর বেলুনে, তাড়াহুড়োতে ওটা হয়ে গেছে বেঙুর। ফেলু তবু নাছোড়বান্দা - বেলুন কবে থেকে প্রাণী হলো? বেলুনে অক্সিজেন, প্রাণীরও অক্সিজেনস তাহলে বেলুন প্রাণী নয় কেন - লালমোহনবাবুর তর্ক। নাছোড় ফেলু বলে বেলুন কবে থেকে অক্সিজেনে ওড়ে?
লালমোহনবাবুর যে কোনও কাজে বা কথায় আলত্তি করাতই যেন ফেলুর আনন্দ। একটা কানাকে তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম লাইন আবৃত্তি করতে শখয়েছিলেন। ফেলু ফুট কাটে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে' দিয়ে শু করা উচিত ছিল। 'গোরস্থানে সাবধান' অভিযানে ফেলু প্রেসিডেন্সি কলেজের শতবার্ষিক উৎসব গ্রন্থকে বারেবারে ওই কলেজের ম্যাগাজিনের শতবার্ষিক সংখ্যা বললেও লালমোহনবাবু একবারের জন্যও ফেলুর ভুল ধরিয়ে দেন নি।
লালমোহনবাবু নিজেকে যতটা অশ্রদ্ধা করে কথা বলুন না, আমরা জানি, তিনি বাংলা রোমাঞ্চ সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দী লেখক। পশ্চিমবাংলার অনেক স্কুল লাইব্রেরিতে তাঁর বই রাখা নয় (দ্র. গোসাঁইপুর সরগম) অনেকেই তাকে নামে চেনে, দেখা হলে অটোগ্রাফ চায়, সভাসমিতিতে সংবর্ধনা দিতে চায়। কেদারনাথে ছোটকাকার কাছ থেকে সেই আলেকার দিনের পাঁচ সাত লাখ টাকা দামের বালগোপাল উপহার পেয়ে বলেছিলেন, ''আপনি তো জানেন না, ছোটকাকা, আজকাল আমি ছোটদের উপম্যাস লিখে টু পাইস করছি। তবে জির কথা তো কিছু বলা যায় না, একদিন দেখব ঝপ করে সেল গড়ে গেছে। তখন লকেটো থাকলে খুব একটা.....''। যতদিন আমরা তাঁকে দেখেছি, তাঁর সেল পড়ে নি। যখন তাঁর সঙ্গে ফেলুদের পরিচয় হয় তখনই তঁার ২১ টি বই লেখা হয়ে গেছে। এটা ১৯৭২ সালের কথা, বাক্স রহস্য উদ্‌ঘাটনের সময়। অবশ্য সোনার কেল্লার অভিযানে, তোপসে বলেছিল, জটায়ু অন্তত ২৫ নি বইয়ের লেখক। ১৯৮১ সালে, নেপোলিয়নের চিঠি উদ্ধারের সময়, তাঁর জায়েন্ট অমনিবাস বেরিয়েছি, বাছাই করা দশটা রহস্যকাহিনীর সংকলন, দাম পঁচিশ টাকা এবং সেলিঙ লাইক হট কচুরিজ। ১৯৮৭ সালে, অপ্সরা থিয়েটারের মামলার সময়, তাঁর ৪১ বই লেখা হয়ে গেছে। ১৯৮৮ সালে, শকুন্তলার কণ্ঠহার উদ্ধারের সময়, তাঁর বই থেকে বার্ষিক আয় তিন লাখ টাকা, যখন ফেলন মাসে সাত-আটটা কেস করে আর কেস পিছু পায় দুহাজার টাকা। এ সব সত্ত্বেও 'এবার কান্ড কেদারনাথে' (১৯৮৪) ফেলু লালমোহনবাবুকে বলেছিল, ''আপনি কন্তু পাবলিকের উপর যে পরিমাণে গাঁজাখুরি চাপিয়েছেন, আলনার নরকভোগ না হয়ে যায় না। 'লন্ডনে ফেলুদা' (১৯৮৯)-তে লালমোহনবাবু যখন বলেন কীভাবে রহস্যের সমাধান হবে তা তংার মাথায় এলেই হলো।'' ফেলু তার শেষ অভিযানে, রবার্টসনের বি-তে, বলে, ''আলনি লেখক, তা যেরকম লেখাই লিখুন না।'' এত অপমানের পরও লালমোহনবাবু কেনও উত্তর দেননি। মধ্যে মধ্যে অবশ্য আমরা তাঁর কিছু কিছু কথাবার্তায়, আচার-আচরণ সমাহলাচনার অভাস পাই। যেমন, কাঠমান্ডুতে মগনলাল লালমোহনবাবুকে এলসডি খাইয়ে দিলে, লালমোহনবাবু ঘোরের মাথায় বলেছিলেন, ফেলুর মাথায় তিনভাগ স্থল একভাগ ঝল। ফেলু বুঝতে পারে নি, মন্তব্যটা কমপ্লিমেন্টারি কি না। আমাদের সন্দেহ নেই, লালমোহনবাবু এলএসডি'র, আড়ালে সমালোচনাই করেছিলেন। এবং করার কারণও ছিল।
একেবারে শেষ রহস্যটাই ধরা যাক। ইনসপেক্টর চৌবে সব কাজ করে বাঁ হাতে, অতএব সে ত্রিশ্চান। এবং চৌবে ত্রিশ্চান হওয়াতেই ফেলু রহস্যের ক্লু পেয়ে গেল। লালমোহনবাবু বলতেই পারেতন, আরে মশাই, পৃথিবীর সব ন্যাটাই কি ত্রিশ্চান!
এর আগে লন্ডন ঘুরে এসে লালমোহনবাবু যে ক হিনীটা লিখেছিলেন, তার নাম ছিল 'লন্ডনে লন্ডভন্ড'। বোধয় তোপসে যেভাবে তার কাহিনী লিখেছিল, তাতে রেগে গিয়েই লালমোহনবাবু ওরকম লন্ডভন্ড নাম দিয়েছিলেন। তোপসে সব অবাসতিব ঘটনা ফেঁদেছিল তার গল্পে। কলকাতা আর দিল্লির স্টেটসম্যানে ফেলু বিজ্ঞাপন দিল, রঞ্জন মজুমদারের বন্ধুর ছবি ছেপে, তার পরিচয় জানার জন্য। রববার বিজ্ঞাপন বেল, বুধবারেই উত্তর। আর কী রকম উত্তর! গ্রান্ড হোটেল থেকে ফোন - জন ডেক্সটার নামে এক টুরিস্ট ভারতবর্ষ বেড়াচ্ছেন, তিনি দিল্লিতে বরাবরওই বিজ্ঞাপন দেখেছেন, বুধবার সকালে কলকাতার গ্রান্ড থেকে ফেলুকে জানালেন, ছবিটি তাঁর খুড়তুতো ভাই পিটারের। দিল্লিতে এতগুলো ইংরেজ দৈনিক চলে, সব চেয়ে কম চলা পত্রিকা স্টেটসম্যানই তাঁর চোখে পড়ল। এমন কি বিজ্ঞাপনটাও! এবং তার কালকাতায়ও আসার কথা। লন্ডন টাইম্‌সের পার্সোনাল কলামে ফেলুর বিজ্ঞাপন বেল দুদিনের মাথায় এক রববার এবং পরের সোমবারই একজন তার হোটেলে সে বলে গেল ফেলু যা জানতে চায়। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের এতটা কার্যকারিতা যে কোনও সার্কুলেশন ম্যানেজার কে উদ্বুদ্ধ

কপবে,অ্যাডবারটাইজিঙ ম্যানেজারকে তৃপ্ত করবে। রঞ্জন আর পিটারের সম্বন্ধের তথ্য যেদিন ফেলু জানতে পারল, সেদিনই রঞ্জনের স্মৃতিশক্তি ফিরে এল। ফেলুরা যেদিন লন্ডন থেকে ফিরল, টি প্লান্টার রোনাল্ড সেদিনই কলকাতায় রঞ্জনকে খুন করল (রঞ্জন পিটারকে খুন করার জন্য) এবং নিজেও আত্মহত্যা কপল (ক্যান্সরে ভোগার জন্য অথবা প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেল বলেই), এতদিন না ক'রে। ফেলু এটা পার ফেক্টটাইমিঙ বললেও, লালমোহনবাবু মনে মনে কী ভাবছিলেন কে জানে। ফেলুর ক্লায়েন্টরা প্রায় সবাইই ফেলুর বাড়ি চলে আসে টেলিফোনে লাইন না পেয়ে, জন ডেক্সটারের কেনও অসুবিধা হয় নি, ঠিক টেলিফোন পেয়ে যায়।

নয়ন রহস্য শেষের দিকে লেখা। তোপসের সমস্যার কথা বলতে গেয়ে, ফেলু বলেছিল, তোপসে লেখে কিশোরদের জন্য, কিন্তু কিশোরদের সঙ্গে তাদের মা, বাবা, পিসি, খুড়ো, জ্যাঠা সকলেই পড়তে থাকে। এত স্তরের চাহিদা (পড়তে হবে নিখুঁত তথ্য আর যুক্তিশৃঙ্খল) মেটানো ক সম্ভব? জটায়ুও সে কথা বলতে পারেন, তিনিও লেখেন কিশোরদের জন্য। তাহলে ফেলু কথায় কথায় জটায়ুর গাঁজাখুড়ি গল্প নিড়ে ব্যাঁকা কথা বলে কেন?

টিনটোরেটোর আঁকা যীশুর ছবি উদ্ধার করতে লালমোহনবাবু ফেলুদের সঙ্গে হঙকঙ গিয়েছিলেন। অভিজ্ঞতার শেষে, তোপসে ফাজলামি কপছে, লালমোহনবাবু লিখলেন, হঙকঙে হিমসিম। ও বোঝে নি, তোপসের অসংক্য অবাস্তব খুঁটিনাটি মেনে নিতেই লালমোহনবাবু হিসিম খেয়ে গেছেন। কীরকম অবাস্তব? ঘটনার সময় ১৯৮২ সাল। বৈকুণ্ঠপুরের নিয়োগী প্যালেসের ছেলে নন্দকুমার (জন্ম ১৯৪৪) দ্রশেখর (জন্ম ১৯১৬) বা দাদা (জন্ম ১৯৪১) তাকে চিনতেই পারলো না? বাবার না হয় চোখ খারাপ। দাদাও ধরতে পারল না? নন্দ ৩৮ বছর বয়সে ছদ্মবেশ ছাড়াই ৬২ বছরের দ্রশেখর সেজে থেকে গেল, কারোর কোনও সন্দেহ হলো না? ফেলুর অবশ্য ংয়েছিল, কিন্তু সেটা নন্দের বাটার জুতো পরা দেখে। ইটালিতে কি বাটা নেই? ইটালি থেকে বেড়াতে আসা টুরিস্টরা ভারতে এসে জুতো কিনতে পারে না? এর চাইতেও বড়ো গন্ডগোল টিনটোরেটোর যীশুকে নিয়ে। রিনেইস্যান্স, গায়োট্টো, বাট্টিসেল্লি, মানটেগনা উচ্চারণ করে লালমোহনবাবু ফেলুর কাছে ঝাড় খেয়েছিলেন, কিন্তু ফেলু যখন বলে টিনটোরেটো ষড়বিংশ শতাব্দীর শিল্পী, তখন তাকে ঝাড় দেওয়ার কেউ নেই। যাঁদের গল্পটা মনে আছে, তাঁরা জানেন, টিনটোরেটোর ছবিটার দুটোনকল করা হয়েছিল। একটা করেছেন রবীনবাবু, যিনি ছদ্মবেশে এসেছে টিনটোরেটো উদ্ধার করার জন্য আর একটি কলকাতার একজন আর্টিস্ট। কিন্তু ওঁরা কতদিনে, কীবাবে করলেন? ছবিটি ছিল তেল রঙের - রবীনবাবুর শার্টের কোনায় যেটা রক্তের দাগ মনে হয়েছিল, সেটা ছিল লাল তেলরঙ - নকল করা হয়েছিল রাত্রি বেলায় কেরোসিনের বা মোমের আলোয় গোপনে। প্রথম যেদিন ফেলুরা ছবিটা দেখে, সেদিন আসল ছবিটাই ঝুলছিল। নিয়োগী বাড়িতে ফেলুরা তিন দিন ছিল না - কলকাতা আর ভলওয়ানগড় আবার এসেছে। এই তিনদিনে রাত্রিবেলায় ছবিটির গোপনে নকলকর্ম ঘটেছে দুবার। প্রথমে রবীন্দ্রবাবু এঁকে আসলটা সরিয়ে নকলটা টাঙিয়েছেন, পরেরটা নকলের নকল করেছেন কলকাতার আর্টিস্ট। দুজুকেই সমান সময় দিতে হলে, দুজনেই পেয়েছেন দেড় রাত। তাও গোপনে। প্রশ্ন হচ্ছে, অল্প আলোয় রোম্যাণ্ঠিক যুগের তেলরঙে আঁকা ছবির নকল সম্ভব দেড় রাতে? যে ছবিতে আঁকা হয়েছে "মাথায় কাঁটার মুকুট, চোখে উদাস চাহনি, ডান হাতটা বুকের উপর আলতো করে রাখা। মাথার পিছনে একটা জ্যেতি, তারও পিছনে গাছপালা-পাহাড়-নদী-বিদ্যুৎ-ভরা মেঘ মিশিয়ে একটা নাটকীয় প্রকৃতিক দৃশ্য।" এমন স্বাভাবিক প্রাকৃতিক চিত্রে যে রঙের স্তর বিন্যাস, সেটা মোমের আলোয় দেখা যায়, নকল করা যায়, গোপনে, দেড় রাতে? আবার সেটা দেড় রাতের মাথায়, রঙ না জেবড়ে, প্যাক করে ফেলা যায়? প্রখরকে সাতবার গুলি খাইয়েও বাঁচিয়ে রেখে লালমোহনবাবু প্যাঁক খেয়েছিলেন ফেলুর কাছে। তোপসে নেহাৎ বাচ্চা ছেলে, তাঁকে প্যাক দেবেন সুজন লালমোহনবাবু? তিন বছর পরে, 'বোসপুকুরে খুনখারাপি'তে লালমোহনবাবু বলেছিলেন, তংার গল্পের গুণ, মনকে টানে, অথচ তলিয়ে দেখলে। অনেক ফাঁকি। আমিসমাহলাচরার সময়ে তিনি লে তোপসের ফেলুদার কাহিনীরই ফাঁক আর ফাঁকির ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন, তোপসে বুঝতেই পারে নি।

পারলে কি চার বছর পরেও 'গোলাপী মুক্তার রহস্য'তে অমন কাঁচা কাজ করে? ফেলুর আলমারি থেকে গোলাপী মুক্তো চুরি করে নকল একটা অনুরূপ মুক্তোএকবার দেখেই বুঝেছিল সেটা দুষ্প্রাপ্য মুক্তো, কিন্তু পঞ্চাশ বছরের মুক্তোর কারবারী সুন্দরলাল ধরতেই পারেনি সেটা ঝুটো, লালমোহনবাবুর স্যাঁকরার।

কাঠমান্ডুতে মগনলালের জাল ওষুধের কারবার তছনছ করার পর তাঁর নতুন কাহিনী নাম দেবেন 'ওম্ ম পদ্মে হুমসাইড' তোপসেরা আপত্তি করাতে তিনি রাগ করে জপযন্ত্র ঘেরাচ্ছিলেন। রাগের কারণ তোপসে বুঝতে পারে নি। যে বাবে সে গল্পটা সাজিয়েছে তাতে বিলক্ষণ ফোকর থেকে গিয়েছিল, আর সেইজ্যুই বোধহয় লালমোহনবাবুর রাগ। বাটরা চরিত্রটাই লক্ষ করা যাক। কাহিীর সূত্রপাত বাটরাকে নিয়ে। তার ব্যবসা কঠমান্ডুতে, ট্যুরিজবের। মগনলাল তার নিজের ব্যবসায় বাটরাকে ভেড়ায়। অনীকেন্দ্র সোম তার জাল ওষুধের স্যাম্পল নিয়ে কলকাতায় গেছে শুনে সেই একই প্লেনে বাটরাকে পাঠায় মগনলাল। গ্রান্ড হোটেলে উঠে বাটরা হোটেলের কিউরিও শপ থেকে একটা নেপালী কুকরি কিনে সেন্ট্রাল হোটেলে ভোরবেলায় অুলকেন্দ্রকে সেই কুকরি দিয়ে খুন করে কুকরিটা নিহত অজীকেন্দ্রের বুকে রেখেই কাঠমান্ডুতে চম্পট দেয়। খুন করার এক দিন আগে অনির্দেশ্য কারণে বাটরা ফেলুর সঙ্গে দেখা করে, এক নকল বাটরার গল্প শোনায় এবং নোকেন্দ্রের বুকে গ্রান্ড হোটেল থেকে কেনা কুকরিটা রেখে নকল বাটরা খুনী এমন একটা গল্প বানানোর সুযোগ রেখে কাঠমান্ডু ফিরে যায়। প্রশ্নটা হচ্ছে বাটরা আদৌ ফেলুরসঙ্গে দেখা করবে কেন? শুধু দেখাই নয়, কোদার্মার সর্ধের সহায়ের রেফারেন্সও দেয়। এসব কেন? সে তো দিব্যি অনীকেন্দ্রকে খুন করে কঠমান্ডু চলে যেতে পারত। ফেলুর কাছে নকল বাটরা, গ্রান্ডে কুকরি কেনা, জাল টাকার গল্প না ফাঁদলে পুলিশ বুঝতেও পারত না, খুনের উদ্দেশ্যে বা খুনির. অস্তিত্ব। অনীকেন্দ্রের নোটবই দেখে ফেলু অবশ্যই কাঠমান্ডু যেত, কিন্তু সেখাননে বাটরা কেনাও ফ্যাক্টর নয়। শেষ পর্যন্ত ফেলু যে মগনলালকে ধরল, তাতেও বাটরার কেনও গাফিলতি নেই। আসলে বাটরা গল্পে একেবারে প্রক্ষিপ্ত, না থাকলেও চলত। গল্পটা অবশ্য ঝমেছে বাটরার জন্যই, কিন্তু রহস্যের সূত্র হিসেবে না।

এমনই প্রক্ষিপ্ত 'জয় বাবা ফেলুনাথ' - এর মছলিবাবা। ওই গল্পের মজা ওই মছলিবাবাকে নিয়ে, কিন্তু পহস্যের সূত্রজালে তার কেনও দান আছে? থাকত, কিন্তু তোপসে গল্পটা লিখতে গিয়ে ব্যাপারটা গুবলেট করেছে। মছলিবাবা মগনলালের স্যাঙাত। তাকে মছলিবাবা সাজানোর উদ্দেশ্য, দুর্গাপূজার পর বিসর্জনের সময় সিংহের মুখটা বাগানো। কেননা সংহের মুখে গণেশটা রাখা আছে। বিসর্জমের দিন মছলিবাবা ঝাঁপ দেবে, কায়দা করে সেই দিনই তার কাশী ছাড়ার দিন ধার্য হয়েছে। বিসর্জনের আগে গণেশ পাওয়া যাবে না, সিংহের মুখে আটকানো যেটা, পূজো চলছে, লোকের অনাগেনা, অতএব সেটা বাগানো যাচ্ছে না। সাঁতার দেওয়া মছলিবাবার পরিকল্পনা সেজন্য। কিন্তু অঙ্কে মিলছে? সিংহের মুখে গণেশ আছে সেটা মগনলাল জানল কবে? অম্বিকাবাবুর বাড়িতে গিয়ে বন্ধু উমানাথের কাছে গয়ে গণেশটা সে কিনতে চায়, উমানাথ সেটা দেবে না, এই কথা কাটা কাটি শুনে উমানাথের ছেলে কু সিন্ধুক থেকে গণেশ বার করে সিংহের মুখে রেখেছে। এবং এই রাখাটা জানিয়েছে বন্ধুটি আর কেউ নয়, মগনলালেরই ছেলে। ছেলের মুখে শুনেই মছলিবাবার চত্রান্তটা করা সম্ভব। কিন্তু বছলিবাবা এসে গেছে বহু আগে। তার কথা ফেলুরা খবরের কাগজে পড়ে এসেছে কলকাতায়। তারা যখন মছলিবাবাকে দেখতে গেল গঙ্গার ঘাটে, তখন মছলিবাবার অনেক বক্ত। অর্থাৎ সিংহের মুখে গণেশ না রাখলেও মছলিবাবা গল্পে এসে গেছে। কী - জন্য?

প্রয়াগ থেকে গঙ্গাবক্ষে সাঁতরে মছলিবাবা কাশী এসেছে সুনে লালমোহনবাবু অবাক হয়েছিলেন, তিববতে গঙ্গার সোর্স থেকেই সাঁতরাচ্ছে নাক মছলিবাবা! অবাক হয়েই ধমক খেয়েছিলেন, তিববত হতে যাবে কেন, গঙ্গার সোত? তাঁরই 'রক্ত-হীরক রহস্য' বইয়ে কুমিরের স্টাচুর মুখে হিরে লুকোনো ছিল, তার সঙ্গে সিংহের মুখে গণেশ রাখার সাগৃশ্য আছে। অথচ তোপসে অতি বিজ্ঞতার সঙ্গে জানিয়েছিল, গণেশ উদ্ধারের পরে, লালমোহনবাবু যে গল্প লেখেন তার সঙ্গে কাশীর ঘটন

ার সাদৃশ্য ততটা নেই, যতটা আছে টিনটিনের একটি কাহিনীর। ফেলু কিন্তু 'রক্ত-হীরক রহস্য' - এর হিরে লুকোনোর তারিফ করেছিল। ফেলু মিত্তির যখন গণেশ উদ্ধারের কাহিনী বলছিল তখন কিন্তু লালমোহনবাবু হেসেই কুটিপাটি। তোপসের ধারণা, সেটা বিকাশের দেওয়া সিদ্ধির জন্য। আমাদের ধারণা, মছলিবাবার ব্যাপারটায় তোপসে গুবলেট করার জন্য।

মনে হতে পারে, যেখানেই মগনলাল ('যত কুড কঠমান্ডুতে,' 'জয় বাবা ফেলুনাথ', 'গোলাপী মুক্তার রহস্য') সেখানেই তোপসে গুবলেট করেছে। তা অর্বস্য নয়। গুবলেট অন্য গল্পতেও হয়েছে। 'বাক্স রহস্য' - এর বাক্সবমলেক কতাটিই তোলা যাক । ওই গল্পে বাক্স বদল সম্ভব করার জন্য শর্ত কী কী ছিল? (১)দুটোরই এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগ হতে হবে (২)দুটোরই হতে হবে নীলরঙের চৌকো অ্যাটাচি কেস (৩)দুটোর হাতলেই থাকতে হবে তিনটি ট্যাগ-ছেঁড়া ইলাস্টিক ব্যান্ড (৪)দুটোরই ওজন হতে হবে সমান, শুধু ম্যানুস্পিটটি ছাড়া। (৫)দুটোরই মুখখোলা থাকতে হবে (৬) ট্রেন থেকে নামার আগে কোনও মালিকই বাক্স খুলবেন না। বাক্স বদল করতেই হবে, শহরে গল্পটা হবেই না। কিন্তু বাক্স বদল না করে পাকড়াশি মশাই যদি লাহিড়ি মশাইয়ের বক্সতেখবরের কাগজ পুরে দিতেন, তাহলে কী হতো? শম্ভুচরণ বোসের পান্ডুলিপে (A Bengalee in Lamaland) তিনি ট্রেনে পড়েছিলেন বটে, তবে তিনি সেটা হারিয়ে মোহটই দুঃখিত হন নি, ওটা উদ্ধার করার কথা তাঁর মনেও হয় নি। বাক্স উদ্ধারের কথা তিনি ভেবেছিলেন শুধু G- মনোগ্রাম দেওয়া মালটি তার মালিককে ফেরত দেওয়ার জন্য। তাঁর ব্যাগটিতে, বাড়ি পৌছে তিনি যদি দেখবেন, পান্ডুলিপির বদলে কবরের কাগজে এসে গেছে, তাহলে তিনি বড়ো জোর ভাবতেন, ঘুবেমর আকর্ষণে তিনি পান্ডুলিপি পড়া শেষ করে ভুল করে খবরের কাগজ ভরেছেন। মনে রাখতে হবে ঘুবেমর বড়ি মেশানো হয়েছিল তাঁর গ্লাসে - স্বাবাবিক ঘুম নয় সেটা। ট্রেনে লোকে খবরের কাগজ পড়ে বার্থের এদিক ফেলে রাখে - ঘুমের ঘোরে ভুল হতেই পারে। তর্কের খাতিরে ধরা যাক পান্ডুলিপির বদলে খবরের কাগজ পেলে তাঁর উপগব্ধি ঘটতে পারত, পান্ডুলিপিটি মূগ্যবান এবং সেটা চুরি করা হয়েছে। তাহলে তিনি গোয়েন্দা লাগাতেন। মনে রাখতে হবে, ফেলু ম্যানুস্পিট (যাকে লালমোহনবাবু বলেছেন ম্যানুস্প্রিন্ট) উদ্ধার করতে পরে নি, পাকড়াশি স্বেচ্ছায় ফেরত দিয়েছিলেন, কপি রেখে। বাক্সবদল না করেন, তিনি পান্ডুলিলি ফেরত দিতে পারতেন, কপি রেখে। লালমোহনবাবু বলেছিলেন ট্রুথ ইজ স্ট্রঙ্গার দ্যান ফিকশন, তখন তোপসের কাহিনীর দুর্বলতার কথা ভেবেই নিশ্চয়ই বলেছিলেন। খামোখা পাকড়াশ মশাই ফেলুদের ধাওয়া করবেন দিল্লি, সিমলা পর্যন্ত, ছদ্মবেশে? চোর চুরির কাছাকাছি থাকতে ভালোবাসে, এই তত্ত্বের পক্ষেও তাঁর সেমলা ধাওয়া করাটা বাড়াবাড়ি।

'ডা. মুন্সীর ডায়রি' - তে লালমোহনবাবু ডায়রিটির একটি জেরক্স করে রেখেছিলেন। তাঁর সৌভাগ্য যে এ-কথা বলার পর তিনি ফেলুর কাছে ধমক খান নি। ফেলু বলতেই পারত, "কী করে জানলেন ওই মেশিনটা ডিরক্স ছিল না ক্যানন ছিল, বলবেন ফোটোকলি করে রেখেছেন।" যাক, লালমোহনবাবুর জন্যই ডায়রিটি রক্ষা পায়, ফেলুর জন্য নয়। একথাই লালমোহনবাবু বলতে চেয়েছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন, "আপনার সিংহাসন কেউ টলাতে পারবে না। আর তারিফের সিংহভাগ আলনিই লাবেন তাতে সন্দেহ নেই। কন্তু সিংহাসনের পাশে একটা ছোট্ট স্পেশাল আসন আর তারিফের পাশে একটা মিনি-তারিফ, এ দুটো আমার বরাদ্দ থাকবেই।" বৃহওম অর্থেই কথাটি সত্য। তোপসের কাহিনী এত নড়বড়ে যে জমাট কাহিনী হিসেবে সেগুলো দাঁড়ায় না। অথচ ফেলুদার কাহিনীর জনপ্রিয়তার খামতি নেই। মুখ্য কারণ জটায়ু।

ডটায়ুর নাম শুনলে আমাদের কেন কেন ছবি ভেসে ওঠে ? এক এক করে ধরা যাক। (১)কোনও বর্ণনা শুনে ভয় পেলে তাঁর মুখ হাঁ হয়ে যায় (দ্র. নেপোলিয়নের চিঠি)। কেনও কিছু মনোযোগ দিয়ে শোনার সময়ও তাঁর মুখ হাঁ হয়ে যায় (দ্র. যত কান্ড কাঠমান্ডুতে)। (২) কেনও রকম সমস্যা না থাকলেও অঘটন ঘটতে পারে তাঁর ক্ষেত্রে। বম্বে থেকে পুনে যাওয়ার পথে তাঁর গলায় কমলা লেবুর বীচি আটকে যাওয়ার পর বিষম লেগেছিল (দ্র. বোম্বাইয়ের বোম্বেটে)

(৩) শারীরিক ভাবে তেমন সমর্থ এখন না হলেও মানসিক ভাবে তিনি তাণ্যে ভরপুর। গাড়ি কিনে প্রদোষদের গাড়ি দেখাতে আসার দিন, গাড়ি থেকে একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে রাস্তায় নামতে গিয়ে ধুতির কোঁচায় পা আটকিয়ে খানিকটা বেসামাল হয়েছিলেন, তাঁর মুখ থেকে হাসি অবশ্য যায় নি (দ্র. বাক্স রহস্য)।

(৪) 'বেড়ানোর প্রস্তাবে তাঁর কখনো না নেই।' 'গোলকধাম রহস্যে' তিনি থেকেও যে কহিনীতে অংশ নেন নি, তার একটি কাহণ পূজার লেখা হবে বলে, আর একটি নিশচয়ই, রহস্যের ঘটনাস্থল কাকাতা, বেড়ানোর কেনও সুযোগ নেই। কৈলাসের নাম তিনি শোমেম নি - কৈলাস বললে বুঝতেন মানস সরোবরের কৈলাস পাহাড়। এলোরার কৈলাস মন্দিরে যাওয়ার প্রস্তাবে দ্বিত্তি না করে তিনি রাজ - প্লেনের টাইম, জামাকাপড় কী নিতে হবে, মশারি লাগবে কিনা, সাপের ওষুধ লাগবে কিনা জেনে দয়ে তিনি উঠে পড়লেন (দ্র. কৈলাসে কেলেঙ্কারি)।

(৫) ভালো লাগলে তিনি সংযমের ধগর ধারেন না। পাটনের মন্দিরের কাকার্য দেখে তিনি অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়, কেল্পনীয়, তেুলনীয়, অননুকরণীয়, অবিস্মরনীয় ইত্যাদি ছাবিবশ রকম বিশেষণ ব্যবহার করেছিলেন গড়ে তিন মিনিটে একটা করে।

(৬) প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হলে তিনি সেটা প্রকাশ করেন কবিতার মধ্যেমে। কাঠমান্ডু যাওয়ার পথে প্লেন থেকে পাহাড়ের চূড়ার পর চূড়া দেখে তিনি ব্লছিলেন, স্তব্ধ বাষ দ্ধশ্বাস বিমূঢ় বিমুগ্ধ বিস্ময়।

(৭) রহস্য রোমাঞ্চের লেখক তিনি। তাঁর দেশভ্রমণের একটা কারণ গল্পের প্লট খোঁজা। তংার মাথায় যে ঠাক পড়ে গেছে তার একটা কারণ প্লটের চিন্তায় মাতার চুল ছেঁড়া (দ্র. অপ্সরা থিয়েটারের মামলা)। তাঁর লেটেস্ট তই কেন্ দেশের ঘটনা নিয়ে জজ্ঞসা করায় তিনি একবার বলেছিলেন, (দ্র. বাক্স রহস্য) এটা প্রায় ওয়ার্ল্ড কভার করা, ফ্রম সুমাত্রা টু সুমে। তবে উপযুক্ত প্রবেশে দেখলে স্থান নিয়ে তাঁর আদেখলেপনা নেই। গোসাঁইপুরের পরিবেশ দেখে যে গল্পটা তিনি গোয়াটেমালায় ফেলবেন ভেবেছিলেন, সেটা গোসাঁইপুরেও ফেলা যায় - তিনি বলেছিলেন।

প্লটের চিন্তায় তিনি সব সময়েই ব্যাকুল। কাশীতে মগনলালের নাইফ-থ্রোয়িঙে তাঁকে অংশ নিতে বাধ্য করায় তিনি বলেছিলেন - হাঁটুতে হাঁটু লেগে খটখট শব্দ হচ্ছে তখন - "বেঁচে থাকলে...পপ্-প্লটের আর ... চি-হি-ন্তা নেই।"

হঙকঙে গুন্ডাদের হাতে গুম হয়ে তাঁর মনে হয়েছিল "যা ঘটল তার কাছে গল্প কোন্ ছার? সব ছেড়েদোব মশাই, ঢের হয়েছে। হনডুরাস ড্যাড্যাড্যাং, কাম্বোডিয়ায় কচকচি আর ভ্যানকুভারের ভ্যানভ্যানানি - দুর দুর।" কিন্তু সে যাত্রায় রক্ষা পেয়ে তিনি লেখেছিলেন 'হঙকঙে হিমসিম'। ওই গুমঘরেই কিন্তু তিনি একটা গান গাইছেলেন অস্পষ্ট বাবে। তোপসে অনেক চেষ্টায় বুঝেছিল, তিনি গাইছিলেন, হরি মিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার করো আমারে।

(৮) উত্তেজিত হন যত সহজে, হতাশও হন তত সহজে। "বোম্বাইয়ে বোম্বেটে' ফিল্ম করতে গিয়ে এক বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে তাঁর কী অবস্থা হয়েছিল মনে পড়ে? যে বইয়ের প্যাকেটটা নিয়ে এত ঝঞ্ঝাট, সেটা নিয়ে তাঁর ভাবনাঃ "কী কুক্ষণেই বইয়ের প্যাকেটটা নিয়েছিলাম।' ক্রমে বর্তমান সঙ্কটের মূল কারণ খুঁজতে খুঁজতে "কী-কুক্ষনেই হিন্দি ছবির জ্যু গল্প লিখেছিলাম', আর সব শেষে, "কী কুক্ষণেই রহস্য উপন্যাস লিখতে শু করেছিলাম পর্যন্ত চলে গেলেন।"

(৯) পদে পদে জিভ কাটা লালমোহনবাবুর সৌজন্যে পরিচায়ক। ভুল হলেই তিনি স্বীকার করে নেন জভ কেটে। তিনি কিন্তু ফেলুর ভুল দেখাতে উদগ্রীব নন। সেনার কেল্লা অভিযানে তিনি একবারও বলেন নি, আরে মশাই, হাজরার একটা ছবি নিয়ে আসবেন তো, তাহলেই তো ধরা পড়ত ভবানন্দ যোধপুরের সার্কিট হ

াউসে।
(১০) তাঁর ভদ্রতার পরিচয় পাওয়া গয়েছিল বোম্বেতে। যে পুলক ঘোষাল দীর্ঘদিন বোম্বে থেকে ফিল্ম পরিচালনা করছে এবং তাঁর গল্প নিয়ে ছবি করবে, সে কীরকম ছবি করে দেখতে গয়ে হতাশ নিনি বলেছিলেন, "গড়পারের চেলে - তুই অ্যাদ্দিম এই করে চুল পাকালি?" তার পরে বলেছিলেন, "যদ্দুর মনে পড়ে বি কম ফেল, - তার কাছ থেকে আর কী আশা করা যায় বলো তো? "কিন্তু পলুক যখন জজ্ঞসা করল, কেমন লাগল ছবি, নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে, তিনি কী আর রূঢ় হতে পারেন, "ওঃ, গড়পারের ছেলে - তুমি দ্যাখালে ভাই - হ্যাঃ"।
এই সব ছোট ছোট ছবি থেকে পুটে ওঠেন যে লালমোহন গাঙুলি তার সঙ্গে বাঙালি যত সহজে নেজেকে আইডেন্ঠিফাই করতে পারে, ফেলুর সঙ্গে ততটা নয়। ফেলু সুপারফিট চিরতণ, কিন্তু সাড়ে তিন বছরের বড় জটায়ু চিরবৃদ্ধ। যে কোনও গোয়েন্দাকাহিনীর গোয়েন্দা হন ধীমান্ প্রতিভাবন্ কখনো কখনো শক্তিমান্। বেলু বন্দুক চালাতে সিদ্ধহস্ত, চর্চা করার দরকার হয় না, ক্যারাটে জানে, মেদবর্জিত প্রায় ছ-ফিট লম্বা তার শরীর। প্লেনে উঠলে গোয়েন্দার কানে তালা লাগাণ সম্ভব? সেজন্য আচেন লালমোহনবাবু। প্লেন যীদ এয়ারপকেটে পড়ে আর সেই সময় গোয়েন্দা কফিতে চুমুক দিতে চায়, আর কফি অন্ননাীীতে না গিয়েশ্বাসনালীতে চলে যায়, গোয়েন্দার কি বিষম খাওয়া সম্ভব? সেজন্যও আছেন লালমোহনবাবু। ফেলু যখন পড়ে, নিবিষ্টচিত্তে সেটা পড়ে, কেনও কিছুই তার একাগ্রচিত্ততা নষ্ট করতে পারে না। সকালে খবরের কাগজে ডেভিড ম্যাককাচ্চনের উল্লেখ আছে এমন অর্টিকল পড়তে গয়েছিলেন লালমোহনবাবু, কিন্তু ধোপা এসে সব মাটি করে দিল।
বাঙালিয়ানার আরও নমুনা? যে কোনও বাঙালির ফোটোগ্রফির প্রথম অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করা যাক। কাশ্মীর বেড়াতে গেয়ে লালমোহনবাবু একটা হটশট ক্যামেরা কিনেছেন, পটপট ছবি তুলছেন, ডেভেলপ আর প্রিন্ট করিয়ে নিজের তারিফ করছেন, "হাইলি প্রফেশনাল"। তোপসে অবশ্য হাসে। এলোরার গুহা দেখতে চাওয়ার সময় ফেলু তার পেনট্যাক্স ক্যামেরা তাক্ করলে, লালমোহনবাবু থেবে যান, সোজা হয়ে হাসি হাসি হাসি মুখ করে পোজ্ দ্যান। তোপসে অবশ্যই ফুট কাটবে, হাঁটা সবস্থাতেও ছবি ওঠে, না-হাসলে অনেক সময় ছবি আরও বেশ ভালো ওঠে।
হাঁটুর বয়সী তোপসের এই পাকা-পাকা কথা শুনলে মধ্যে মধ্যে মাথা গরম হয়ে যায়। নিজেকে নিয়ে লালমোহনবাবু নেজেই কম মশকরা করেন না। কাঠমান্ডুতে মোমো খেয়ে তিনি তার পাকপ্রণালী জানার চেষ্টা করেছিলেন - "উইকে একদিন করে মোমো খেতে পারলে মশাই ছ'মাসের মধ্যে চেহারায় একটা ধ্যানী ভাব এসে যাবে।" এর পরেই তোপসের কথায় গা জ্বালা করে - লালমোহনবাবুকে দেখে তখনই তার নাকি সবচেয়ে বেশি হাসি পায় যখন তিনি মাঝে মাঝে ধ্যানী ভাব আনার চেষ্টা করেন। প্লেনে অনেকেরই প্রথম ওই অবস্থা হয় - ব্রেকফাস্টে কফির চামচ দিয়ে অমলেট কেটে খাওয়া, ছুরিকে চামচের মতো ব্যবহার করে শুধু শুধু মারমালেড খাওয়া, আর কাঁটা দিয়ে কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে না পেরে গাত দিয়ে কাজ সারা। লালমোহনবাবু যদি অমনটা করেই থাকেন, তাতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হলো? তরাইয়ের জঙ্গলে গৃহস্থ মহীতোষবাবু তো বলেইছিলেন, লালমোহনবাবু বিলিতি কায়দায় রোস্ট করা মুরগি কাঁটাচামচ দিয়ে ম্যানেজ না করতে পারায়, পাখির মাংস হাতে খেলে কেতায় কোনও ভুল হয় না। জঙ্গলে বেড়াতে গয়ে কোন্ বাঙালি ছাগলকে হরিণ ভাবে না, শেয়ালের ডাককে বাঘের ডাক ভেবে আঁতকে ওঠে না? লালমোহনবাবু রহস্যরোমাঞ্চ লেখেন বলেই অন্য বাঙালির থেকে আলাদা হবেন নাকি? এয়ারপকেটে প্লেন যখন উলটিপালটি খায় তখন কোন্ বাঙালির মনের অবস্থা লালমোহনবাবুর মতো হয় না, "এ লে মশাই, চিৎপুর রোড দিয়ে ছ্যাকড়া গাড়িতে করে চলেছি মনে হচ্ছে। নাটবল্টু সব খুলে আসচে না তো?"
পুরী স্টেশনে বুক স্টলে চোখের সামনে জটায়ুর বই সাজানো থাকলেও লালমোহনবাবু দোকানীকে জিজ্ঞস করেছিলেন, জটায়ুর বই আছে? এমন লোকের সঙ্গে আইডেন্টিফিকেশন হবে না তো কার সঙ্গে হবে? এলোরার ডাকবাংলোতে লালমোহনবাবু বলেছিলেন, "এবার একটা নতুন রকমের ফাইট ইন্ট্রোডিউস করিচ যাতে হিরোর হাত-পা বাঁধা রয়েছে - কিন্তু তাও শুধু মাথা দিয়ে ভিলেনকে ঘায়েল করে দিচ্ছে।" তোপসের কটাক্ষ, 'মাথা দিয়েমানে বুদ্ধি না মাথার গুঁতো'? আমাদের জজ্ঞসা, গোলাপী মুক্তো উদ্ধার করার জ্য ফেলু কাশীতে মগনলালের বাড়িতে ডাকাতি করলো - সেই ডাকাতিই বা কতটা বিশ্বাসযোগ্য? তোপসের কোনও কোনও কাহিনী উতরে গেছে, কিন্তু সব কাহিনী নয়। বোসপুকুরের দেবনারায়ণবাবু খুব অন্যায্য কথা বলেন নি, "এ জিনিস (শখের গোয়েন্দাগিরি) উপন্যাসে চলে, রিয়েল লাইফে চলে না।" জটায়ুকে নিয়ে অন্য লোকে হাসুক, তোপসে কেন হাসবে? লালমোহনবাবুকে যৎপরোনাস্তি শ্লেষে বিদ্ধ করলেও ফেলনকে আমরা ক্ষমা করে দিই, 'ভূস্বর্গ ভয়ংকর'-এ। কাশ্মীরে তাকে দুবার মারতেচেয়েছিল কে, ফেলনকে আমরা ক্ষমা করে মিই, "যাক্ বাঁচা গেল। আলনার ভুল হতে পারে এটা জানতে পারলে একটু ভরসা পাওয়া যায়," বলেছিলেন লালমোহনবাবু। ফেলু জানায়, "আলনি অযথা বিনয় করছেন। আবি কিন্তু বহু চেষ্টা করলেও আলনার মতো লিখতে পারতাম না।" এটা হয় তো খোঁচা নয়, তবে খোঁচায় অভ্যস্ত লালমোহনবাবু বলেছিলেন, "থ্যাঙ্কস্ ফর দ্য খোঁচা।"
কেদারনাথের রাস্তা সম্পর্কে কোনও রকম ধারনা আছে কি না প্রশ্নে লালমোহনবাবু অল্প হেসে বলেচিলেন, তিনি কবি বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের ছাত্র, কবির সব কবিতা তাঁর মুখস্থ, এবং তাঁর কবিতা থেকে মদশকালের যে ভিভিড পরিচয় তাঁর আছে, তা কি অন্য কার আছে? তোপসের ফেলুদার কাহিনীগুলোতে লালমোহনবাবুর ছবিটিই যে সবচাইতে ভিভিড, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে কি?

পরিশিষ্ট
সাময়িক পত্রে ফেলুদার রহস্যকাহিনী প্রকাশের সাল ঃ
(* চিহিত কাহিনীতে জটায়ু অনুপস্থিত)

১ * ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি ঃ সন্দেশ ১৯৬৫ ডি-১৯৬৬ ফে
২ * বাদশাহী আংটি ঃ সন্দেশ ১৯৬৬
৩ * কৈলাস চৌধুরীর পাথর ঃ সন্দেশ ১৯৬৭
৪ গ্ধ শেয়াল দেবতা রহস্য ঃ সন্দেশ ১৯৭০
৫ গ্ধ গ্যাংটকে গন্ডগোল ঃ শরদীয় দেশ ১৯৭০
৬ সোনার কেল্লা ঃ শরদীয় দেশ ১৯৭১
৭ বাক্সরহস্য ঃ শরদীয় দেশ ১৯৭৩
৮ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ঃ শারদীয় দেশ ১৯৭৩
৯ * সমাদ্দারের চাবি ঃ শরদীয় সন্দেশ ১৯৭৩
১০ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ঃ শারদীয় দেশ ১৯৭৪
১১ ঘুরঘুটিয়ার ঘয়না ঃ শারদীয় সন্দেশ ১৯৭৫

১২ জয় বাবা ফেলুনাথ ঃ শারদীয় দেশ ১৯৭৫
১৩ গোসাঁইপুর সরগরম ঃ শারদীয় দেশ ১৯৭৬
১৪ বোম্বাইয়ের বোম্বেটে ঃ শারদীয় দেশ ১৯৭৬
১৫ গোরস্থানে সাবধান ঃ শারদীয় দেশ ১৯৭৭
১৬ ছিন্নমস্তার অভিশাপ ঃ শারদীয় দেশ ১৯৭৮
১৭ হত্যাপুরী ঃ শারদীয় দেশ ১৯৭৯
১৮ * গোলকধাম রহস্য ঃ শারদীয় সন্দেশ ১৯৮০
১৯ য়ত কান্ড কাঠমান্ডুতে ঃ শারদীয় দেশ ১৯৮০
২০ নেপোলেয়নের চিঠি ঃ সন্দেশ ১৯৮১
২১ টিনটোরেটোর যীশু ঃ শারদীয় সন্দেশ ১৯৮২
২২ জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা ঃ শারদীয় সন্দেশ ১৯৮৩
২৩ অম্বর সেন অন্তর্ধানরহস্য ঃ শারদীয় আনন্দমেলা ১৯৮৩
২৪ এবার কান্ড কেদারনাথে ঃ শারদীয় দেশ ১৯৮৪
২৫ বোসপুকুরে খুনখারাপি ঃ শারদীয় সন্দেশ ১৯৮৫
২৬ দার্জিলিঙ জমজমাট ঃ শারদীয় দেশ ১৯৮৬
২৭ অপ্সরা থিয়েটারের মামলা ঃ শারদীয় দেশ ১৯৮৭
২৮ ভূস্বর্গ ভয়ংর ঃ শারদীয় দেশ ১৯৮৭
২৯ শকুন্তলার কণ্ঠহার ঃ শারদীয় দেশ ১৯৮৮
৩০ লন্ডনে ফেলনদা ঃ শারদীয় দেশ ১৯৮৯
৩১ গোলাপী মুক্তার রহস্য ঃ শারদীয় সন্দেশ ১৯৮৯
৩২ ডা মুনসীর ডায়ারি ঃ শারদীয় সেন্দশ ১৯৯০
৩৩ নয়নরহস্য ঃ শারদীয় দেশ ১৯৯০
৩৪ রবার্টসনের বি ঃ শারদীয় দেশ ১৯৯২
৩৫ ইন্দ্রজাল রহস্য ঃ রচনাকাল? ঃ সন্দেশ অগ্র-পৌ মা, ১৪০২ (১৯৯৫) ।মোহিত রায়

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com